দুই নায়িকা

খবরটা এনেছিল মাধব ঘোষের বিধবা শালীর সেই আধাহাবা ছেলেটা। যে ছেলেটাকে আর যে শালীকে নিয়েই মাধব ঘোষের সংসার।

বাড়িওলার আদরের পুষ্যি, তবু ছেলেটাকে কেউ মানুষের দরে গণ্য করে না। আর বাইরে থেকে এক একটা খবরের ঢেউ বয়ে এনে হাঁফানো-লাফানোই তো কাজ তার! কে শুনবে সে খবর? মাধব ঘোষের বাসার ভাড়াটের মধ্যে কারই বা এত সময় আছে যে গালগল্প করবে বসে?

তাই সে যখন হাঁফিয়ে তোৎলামি করে আর হাত মুখ নেড়ে বলছিল, 'ও বাবা, সে কি রক্ত! যেন এক কুড়ি পাঁঠা কেটেছে'—তখন নিতান্ত কৌতূহলী দু'একজন রান্নার চালা থেকেই মুখ বাড়িয়ে জিগ্যেস করেছিল, 'কোনখানে রে?'

কেউ কিছু জিগ্যেস করলেই ছেলেটা আরও তোৎলা হয়ে যায়। উত্তর পেতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, তাই ওরা বাড়ানো মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আপন মনে বলেছিল, 'ভগবান পৃথিবীর ভার কমাচ্ছে। এই সেদিন ওখানে একটা গরু কাটা পড়ল।'

তা একটা অচেনা অজানা মানুষের সঙ্গে একটা গরু-মোষের পার্থক্য কি? গরু বরং ভগবতী। কাটা পড়েছে শুনে মেয়ে মানুষের মন একবার শিউরে উঠতে পারে। মানুষ একটা রেলে কাটা পড়েছে, এ খবরের নতুনত্ব কোথায়?

পৃথিবীতে দৈনিক হাজার হাজার মানুষ এক্সিডেন্টে মরছে না?

তখন ভর দুপুর।

বাড়ির জোয়ান পুরুষরা সকলেই কাজের ধান্দায় বাইরে। মেয়েরা কেউ কেউ সকালের পাট সেরে রাতের রান্না সারতে বসেছে। কেউ কেউ ইস্কুল ফেরত ছেলেমেয়েদের জন্যে রুটি গড়ে রাখছে, আর ছোটো সংসারের কেউ কেউ ভাতের কাঁসি নিয়ে বসেছে। খেয়ে উঠে ছাই মাটি শালপাতা আর পোড়া কড়া নিয়েও বসেছে এক আধ জন।

মাধব ঘোষের বাসায় তেরো ঘর ভাড়াটের ঘরে তেরো রকম কাজ চলছিল তখন। আধাহাবা মদনার সঙ্গে 'রেলেকাটা' দেখতে ছুটবে, এত উৎসাহ কারুর আসেনি।

হোক না বাড়ির কাছাকাছি, খেটে পিটে ক্লান্ত সবাই। হ্যাঁ, নিজেদের বাড়ির পুরুষরা বাড়ি থাকত, তা হলেওবা তাদের ছায়ায় ছায়ায় গিয়ে না হয় উঁকি দেওয়া যেত।

তাও এসব হ্যাঙ্গাম হুজুতে উঁকি দেবার সখ পুরুষদেরও বড়ো থাকে না। কে জানে বাবা, আবার পুলিশের নজরে পড়ে যেতে হবে কি না, সাক্ষী দিতে যেতে হবে কি না।

কাজেই মদনা, যতই 'হেই হেই' করে বলুক 'দেখবে তো চল। এখনও পড়ে আছে—' কেউ গ্রাহ্য করেনি। বরং অজিতের বউ মলিনা কয়লা ভাঙতে ভাঙতে একবার হাতের শব্দ থামিয়ে কথাটা শুনে নিয়ে বিরক্তিতে মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল,—'এ ছোঁড়ার কাজের মধ্যে কাজ যত হাড়হাবাতে উনচুটে খবর বাড়িতে নিয়ে আসা।'

মদনার মা সুখদা শুধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করেছিল ছেলেকে। 'হ্যাঁরে মেয়ে না বেটাছেলে? ...বেটাছেলে? জোয়ান? মুণ্ডুটা একেবারে থেঁতলে গেছে? তা কি বলছিল লোকে? নেহাত অপঘাত না আত্মহত্যে?'

সুখদার চাঁছাছোলা গলার প্রশ্ন কিছু কিছু শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু তোৎলা মদনার উত্তর আর কারুর বোধগম্য হচ্ছিল না।

তারপর মদনার মা ছেলেকে রোদে ঘোরার জন্যে বকে, হাতে মুখে জল দিয়েই তার মেসোর কাছে শুইয়ে রেখে গেল।

মাধব ঘোষের ঘরে একটা ঘাড়-নড়া টেবিল ফ্যান আছে, সেই সুখের আস্বাদের ভাগ সুখদা নিজের ছেলেকে না দিয়ে ছাড়ে না। আর কাজকর্ম সারা হলে, নিজেও এসে মেঝেটায় গড়াগড়ি দেয়।

তা কাজকর্ম তাকেও নিজের হাতেই করতে হয়, বাড়িওলার শালী বলে যে বাসন মাজতে ঝি রেখেছে তা নয়। রাখতেই বা দেবে কেন মাধব ঘোষ? একাধারে ঝি, রাঁধুনী, ঘরগুছুনি পাওয়া যাবে বলেই না দু' দুটো মানুষকে ভাত কাপড় দিয়ে পোষা।

মাধব ঘোষের বাসার এই ভাড়াটেরাও সে হিসাব জানে। তাই সুখদা নিজে যতই আস্ফালন করুক, বাড়িওলির মর্যাদা তাকে কেউ দেয় না।

এই যে ও তখন উঠোনের দড়িতে ভিজে কাপড় মেলে দিতে দিতে গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল—'কি গো মলিনা, একদিনে কত কয়লা ভাঙছ?' তখন কি মলিনা ভালো করে উত্তর দিল?

দিল না।

বেজার মুখে বলল, 'দাসদাসীতো নেই যে তাদের পিত্যেসে ফেলে রাখব? মাসের কয়লা একবারেই ভেঙে তুলছি।'

সুখদাও বেজার মুখে বলল, 'তা তো বেশ করছ, কাজের সুসার করছ। বলি একটা বুড়োমানুষ যে একটু চোখ বুজেছে সেটাও তো ভাবতে হয়।'

মাধব ঘোষের প্রসঙ্গে সুখদা সব সময় 'বুড়োমানুষ' শব্দটা ব্যবহার করে। অথচ মাধবের বয়েস মাত্র একান্ন বাহান্ন হতে পারে। তাই ওই 'বুড়োমানুষে' কেউ সহানুভূতিতে উছলে পড়ে না। মলিনাও পড়ল না। আরও জোরে জোরে হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে ভারী গলায় বলল,—'তা আর কী করা যাবে? মাস মাস ভাড়াটি ঘরে তুলতে হলে এসব উৎপাত তো একটু সইতেই হবে।'

মলিনার এই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাবের জন্যে সুখদা বেশি কথা এগোতে পারে না। আর মলিনারা জাতে বামুন বলে মাধব ঘোষও একটু সমীহ করে। কাজেই সুখদা রণে ভঙ্গ দিল।

মলিনা সব কয়লাগুলো ভেঙে তুলল, গুঁড়োগুলো চেলে গুল পাকাবার জন্যে আলাদা করে রাখল, একেবারে বিকেলের রান্নার উনুনটা সাজিয়ে ফেলল, তারপর সাবান নিয়ে কলতলায় ঢুকে গেল।

অজিত অন্য আর সকলের থেকে ভাড়া বেশি দেয়, তাই মাধব ওদের জন্যে আলাদা একটা কলতলা করে দিয়েছে। ছ্যাঁচা বেড়ার দেওয়াল, টিনের চাল, আর কর্পোরেশনকে লুকিয়ে একটা বাড়তি 'ট্যাপ'—এই ঐশ্বর্য।

সেই ঐশ্বর্যের গর্বেই মলিনা নিজেকে ওই 'বারো ভূতেদের' থেকে বিশিষ্ট ভাবে। রাত্তিরে পুরো রান্নাও এ বাড়িতে একা মলিনাই করে। আর সকলে কেউ কেউ ডাল তরকারি রেঁধে রাখে, রাত্রে শুধু ভাতটা রাঁধে কি রুটি দু'খানা গড়ে নেয়। কেউ বা উনুন জ্বালার পাটই করে না, সব কিছুই সেরে রাখে।

মলিনাই মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'সকালের তরকারি? মুখে তুলবে ও? হুঁঃ! তা হলে তো বেঁচে যাই। তোমাদের মতন একটা বেলা তবু জিরিয়ে বাঁচি। তা হবার জো নেই।'

জো আছে কি নেই—কে জানে, তবে হওয়ায় না মলিনা। বিকেলে পরিপাটিটি হয়ে দাওয়ায় বসে তোলা উনুনে রাঁধে। ডিমের ডালনা, আলু পেঁয়াজের চচ্চড়ি, রুটি কি দালদার পরোটা।

উঠোন ঘিরে দাওয়া আর দাওয়া ঘিরে যত ঘর, মলিনার এই রন্ধনলীলা সবাই দেখতে পায়।

এবাড়ি ওবাড়ির ছেলেপুলেরা বলে 'বেশ বাস বের করেছে বামুন কাকি! তোমরা কেবল ছাইয়ের রান্না রাঁধো।'

তাদের মায়েরা বিরক্তিতে নাক কুঁচকে বলে, 'আমাদেরও যদি তোদের বামুন কাকির মতন আপনি আর কোপনির সংসার হত, বাস বেরোনো রান্না রাঁধতাম। তোমাদের ব্রহ্মাণ্ড ভরাতেই যে—'

আজও মলিনা সেই সুবাস বেরোনো রান্না রাঁধতে বসেছিল।

আজকের সেই দুপুরে সাবান দিয়ে গা ধুয়ে এসে চুল বেঁধে পরিপাটি হয়ে একটা সেলাই নিয়ে বসেছিল।

কল চালাতে জানে, কিন্তু কল নেই। তাই হাতেই একটা সায়া সেলাই করে ফেলে, সাজানো উনুনটায় আগুন ধরিয়ে যখন রাঁধতে বসল, তখন সন্ধে হয় হয়।

সেলাইয়ের ঝোঁকে বেলা গড়িয়ে ফেলে মনটা ধড়ফড় করছিল। অজিত এসে পড়লেই মুশকিল। এলেই রান্না কামাই দিয়ে চা বানাতে হবে, পাঁপড় কি দু'খানা বেগুনী ভেজে দিতে হবে। সব গড়িয়ে যাবে।

মাসের প্রথম দিক বলে রান্নার উপকরণেও বাহুল্য ছিল। একটা ডালনা, একটা চচ্চড়ি, আবার দু'রকম ভাজাও। ব্যস্ত হাতে সারতে সারতে হঠাৎ খেয়াল হল মলিনার, অজিতের ফেরার সময়টা যেন পার হয়ে গেছে।

ভাবল, দেখ—আমি কোথায় দেরী হয়ে গেছে বলে ধড়ফড়িয়ে মরছিলাম, আর আজই ও দেরী করছে।

মাখা ময়দা ঢেকে রেখে উনুনে কুচো কয়লা দিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ, অজিত এলে গরম পরোটা ভেজে দেবে বলে, কিন্তু ক্রমশ উনুন ঝিমিয়ে এল। মনটাও তখন অস্থির হয়ে উঠেছে। কোনোরকমে পরোটা ক'খানা বেলে ফেলে ভেজে রাখল, আর তারপর ঘরবার করতে লাগল।

এত দেরী কিসের?

কই এত দেরী তো করে না কোনোদিন।

কাজ করে অজিত একটা কবরেজী ওষুধের দোকানে। তবে কবরেজী ওষুধের চেয়ে গন্ধতেলের ব্যবসাটাই তাদের চলে ভালো। 'আমলার তেল' আর 'কুন্তল বিলাস' এই দুটোর ভীষণ কাটতি।

মলিনার চুলে 'কুন্তল বিলাসের' গন্ধও মলিনাকে এ বাড়িতে আর একটু বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। অজিতের কাজ হচ্ছে প্যাক্ করা। গুনে গেঁথে হিসেব মিলিয়ে দিতে হয়। তবু মলিনার জন্যে এসে যায় কোনো ফাঁকে কুন্তল বিলাস, আমলার তেল।

অজিত বলে, 'হুঁ হুঁ বাবা, অমনি না। হোমিওপ্যাথির শিশি রাখি কাছার খুঁটে, আর কোম্পানির শিশিতে তেল ভরবার সময় একটু একটু করে কম ভরে খানিকটা সরাই।'

দাঁতের মাজন, হজমের ওষুধ সবই সরায় অজিত।

মলিনা ভাবল, সেই রকম সরানো টরানো কিছু ধরা পড়ে গিয়ে গোলমাল বাধেনি তো? মালিক আটকে রাখেনি তো? কিন্তু কতক্ষণ আটকে রাখবে? লঘুপাপে কি গুরুদণ্ড দেবে? রাত যে দশটা বাজল!

যে মানুষ পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় আসে!

সামনের ঘরের স্বপনের মা মলিনার কার্যকলাপ লক্ষ করছিল। মলিনার উনুনে কয়লা দেওয়া, আবার নিভন্ত আগুনে যেমন তেমন করে খাবারটা করে নেওয়া সবই দেখেছে।

এখন ওর অস্থিরতাও দেখল।

ডাক দিয়ে বলল, 'অ মলিনা দি, অজিতবাবু ফেরেননি?'

মলিনার বুকের মধ্যে তোলপাড় করছিল, এই প্রশ্নে উছলে কান্না এল তার। সেই কাঁদো কাঁদো গলাতেই বলল, 'না ভাই, ভেবে মরছি। কী হল কিছু বুঝি না। এমন তো কোনোদিন করে না।'

কথাটা সত্যি।

বাড়ি ফিরে চা টা খেয়ে আবার বরং বেরিয়ে রাতটাত করে কোনো কোনোদিন অজিত, কিন্তু কাজ ফেরত সোজাই বাড়ি আসে।

স্বপনের মা চিন্তিত গলায় বলল, 'বলে যাননি কিছু?'

'না, কিছু না।'

'তাইতো!'

রাত দশটার নিশুতি হয়ে আসা উঠোনে এই প্রশ্নোত্তর যেন একটা গা ছমছম বিপদের ইসারা নিয়ে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে সব ঘরের দোর থেকেই উদ্বিগ্ন প্রশ্ন এসে এসে আছড়ে পড়তে লাগল। মেয়ে পুরুষের গলা।

'অজিতবাবু আসেননি? ...অজিতবাবু আসেননি?...সে কি? কোথাও যাবার কথাটথা ছিল না?'

ছোটো ছেলে মেয়েরা সকলেই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, বড়োরা কেউ খাবে, কেউ খেতে বসেছে। সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠল।

একটা মানুষ, নিয়মী মানুষ, সে হঠাৎ কাজ থেকে বাড়ি ফিরল না, এ যে বড়ো সর্বনেশে কথা!

অহঙ্কারী মলিনা, যে নাকি কখনও নিজের দাওয়া থেকে ভিন্ন অন্যের দাওয়ায় এসে কথা বলে না, সে একবার স্বপনদের দাওয়ায়, একবার ভোম্বলদের দাওয়ায়, একবার নগেনবাবুর দাওয়ায় এসে কাতর হয়ে বলতে লাগল, 'কি হবে ভাই! খবর পাবার কী হবে? মন যে ধৈর্য মানছে না। রাত তো ক্রমশঃই গভীর হয়ে এল। বুকের মধ্যে হিম হয়ে আসছে আমার।'

সকলেই উদ্বিগ্ন গলায় সহানুভূতি জানাতে লাগল। কিন্তু এত রাত্তিরে খবর পাবার প্রশ্নটায় গা করল না কেউ। কেন কোথায় খবর?...ওর সেই দোকান কি আর খোলা আছে এখন?

সাড়া শব্দে—'বুড়ো মানুষ' মাধব ঘোষও সুখশয্যা ছেড়ে উঠে এসে জিগ্যেসাবাদ করতে লাগলেন।

সুখদা টিপে টিপে বলতে লাগল, 'ওমা, এতক্ষণ কি তুমি ঘুমোচ্ছিলে মলিনা? মানুষটা আসে সন্ধেবেলা, আর এখন এই রাত্তির এগারোটা! এখন তুমি লোক জানাজানি করছ বাড়ি আসেনি বলে। সময়ে টের পেলে তো—পাঁচজনে একটা বিহিত করতে পারতো!'

মলিনার এখন দুঃসময়।

তাই মলিনা চট করে মুখে মুখে উত্তর দিল না। নইলে কি, না বলে ছাড়তো, 'একদণ্ড দেরী দেখেই যদি ডাক ছেড়ে লোককে উত্যক্ত করি, তাহলেও তো দুষতে গো!'

এখন বলল না।

এখন মাধব ঘোষের কথার উত্তর দিল। 'যেমন যায় তেমনিই গিয়েছিল। শরীর তো ভালোই ছিল। এখন খবর নেবার কি হবে বলুন?'

মাধব ঘোষ নীরস গলায় উত্তর দেয়, 'এখন আর এই রাতদুপুরে কি বলব বাছা?'

মলিনা নয় বিপদেই পড়েছে। তবে স্বভাবটা কি একেবারে যাবে? যে স্বভাব না কি মরলেও যায় না।

তাই সে-ও বিরস গলায় বলে ওঠে, 'তা আপনার বাড়ির ভাড়াটে, দায়িত্ব তো আপনারই, একটা যদি বিপদ আপদ ঘটে থাকে, থানা পুলিশ হয়, আপনাকেই আগে ধরবে।'

থানা পুলিশের কথাটাই মনে আসে মলিনার। কারণ, ওর মনে সেই চুরির কথাই পাক খাচ্ছে। কি জানি, অজিত শুধুই বাড়িতে এক আধ ছিটে আনে, না সরিয়ে ফেলে বাইরে মোট মোট বেচে। এমন তো কত শোনা যায়, তলে তলে মনিবকে ফাঁক করে কর্মচারীতে।

মানুষকে বিশ্বাস নেই।

স্বামী বলেই যে অজিতকে মলিনা সত্যসন্ধ পুরুষ ভাববে তার মানে নেই।

কিন্তু থানা পুলিশের কথায় মাধব ঘোষ শিউরে উঠল, 'থানা পুলিশ কেন? থানা পুলিশ কেন? তেমন সন্দ আছে তাহলে?'

মলিনার সেই কান্না ভাবটা কমে এখন ঝগড়াটে মূর্তি ফুটে ওঠে। সে-ও সমানে সমানে বলে, 'কেন, শুধু চুরি ডাকাতি করলেই থানা পুলিশ হয়? পথে বিপদ হলে হয় না? এমন কিছু খোকা নন আপনি যে জানেন না। এতগুলো পুরুষ বাড়িতে থাকতে, বাড়ির একটা মানুষ বেঘোরে হারিয়ে যাবে? খোঁজ হবে না?'

এতক্ষণ যারা সহানুভূতিতে বিগলিত হচ্ছিল, তারা সহসা মলিনার এই রূপান্তরে অন্যমূর্তি নেয়। বিরূপ মন্তব্যের ফিসফিসিনি ওঠে। মাধব ঘোষের সঙ্গে লাগছিল, বেশ হচ্ছিল। বাড়িওলাকে কেউ দু'চক্ষে দেখতে পারে না। এই ছুতোয় ও একটু অপদস্থ অপমানিত হয় হোক।

কিন্তু হঠাৎ এ আবার কি!

কেউটে যে ল্যাজে ছোবল মারতে এল আর তবে কে সহানুভূতিতে গলবে?

নগেনবাবুর স্ত্রী গলা তুলে বললেন, 'বুঝলাম তো সবই। কিন্তু চারদিকের বাস ট্রাম বন্ধ হয়ে এল, লোকে কে কি করবে? যা করবার সকাল হলে করা হবে।'

একথায় হঠাৎ আবার মলিনার ভেতরের কান্নার সমুদ্র উথলে উঠল। কেঁদে উঠেই বলল, 'মেয়েমানুষ হয়ে একথা কোন প্রাণে বললেন মাসিমা? এই সারারাত আমি কি ভাবে কাটাব, তা ভাবছেন না?'

নগেনবাবুর স্ত্রী কি উত্তর দিতেন কে জানে, ঠিক এই সময় সুধানাথ ফিরল কাজ থেকে। সুধানাথের চাকরি হচ্ছে, সিনেমার টিকিট চেকারি। তাই লাস্ট শো সেরে ফিরতে ওর প্রায় বারোটা বাজে। বাইরে থেকে খেয়েই ফেরে।

ও যখন ফেরে তখন বাড়ি নিশুতি হয়ে যায়, উঠোনের ছোটো দরজাটা ভেজানো থাকে। নিঃশব্দে ঢুকে আস্তে দরজাটায় খিল লাগিয়ে নিজের কোণের দিকের ঘরটার সামনে দাঁড়ায়, চারিদিকের ভিতর থেকে বন্ধ ঘরগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে, হয় তো বা একটা নিশ্বাস ফেলে। তারপর নিজের বাইরে থেকে তালা লাগানো ঘরটা আস্ত একটি চাবির মোচড় দিয়ে খুলে ঢুকে পড়ে।

আলো-টালো জ্বালে না, টর্চটা টিপে একবার দেখে যেন, তারপর বাইরের উঠোনের মস্ত চৌবাচ্চাটার তলায় ঠেকা এক ছিটে জল মগ ঠুকে ঠুকে তুলে হাত মুখ ধুয়ে, ঘরে এসে বাইরের জামা-পোশাক বদলে শুয়ে পড়ে।

ঘরের মধ্যেই টাঙানো দড়িতে লুঙ্গিটা শুকোতে দিয়ে যায় সকালে, সেটাই ওর রাত কাপড়।

বিছানা কোনোদিন তোলা হয় না, অতএব পাতার কথাও ওঠে না। তিন-চার মাস অন্তর এক আধদিন সকালে বিছানার চাদরটাকে নিয়ে কাচতে দেখা যায় সুধানাথকে।

সকালের দিকে আর একটা কি যেন কাজ করে। খাওয়াটা সেখানে জোটে। বোধহয় কোনো মাড়োয়ারি গদিতে খাতা-পত্তর দেখে। সেখানে কর্মচারীদের জন্যে রান্না হয়। মাছ মাংস নয়, সাত্ত্বিক।

সকালে ওই সাত্ত্বিক খানা, রাত্তিরে রেস্টুরেন্টে রুটি মাংস। এই চালিয়ে চলেছে সুধানাথ যতকাল মা মরেছে তার।

বউ?

না, বউ বস্তুটা আর কপালে জোটেনি তার। কে দেখেশুনে দেয়, এইজন্যেই হয়ে ওঠেনি। তারপর তো মেঘে মেঘে বেলা যাচ্ছে। বন্ধুবান্ধবরা কিছু বললে বলে, 'বেশ আছি বাবা! সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো।'

কিন্তু রাত্রে বাসায় ফিরে ঘরে ঘরে বন্ধ দরজা দেখে নিশ্বাস পড়াটাকে আটকাতে পারে না। নিজের ঘরটাকে একটা ঘৃণ্য জায়গা বলে মনে হয় তার।

আজও যথারীতি টর্চ টিপে টিপে গলিটা পার হয়ে এসেছিল সুধানাথ, দরজা ঠেলতেই চমকে উঠল।

সব ঘরের দরজা খোলা, আলো জ্বালা, আর ঘরের মালিকরা সকলেই প্রায় ঘরের বাইরে।

মাঝখানে নাক উঁচু মলিনা বসে কাঁদছে। বাসার কারও সঙ্গেই খুব একটা ঘনিষ্ঠতা নেই সুধানাথের। সম্পর্ক তো মাত্র সেই সকাল বেলা ছ'টা থেকে সাতটা অবধি। যেটুকু সময় জল আর কল নিয়ে বচসা।

তবে মলিনার আলাদা কলঘর আছে বলে, আর মলিনা সেই কলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঁচজনের সামনে দাঁতে বুরুশ করে বলে, সুধানাথ ওকে দেখতে পারে না। মনে মনে নাম দিয়েছে —'উঁচুনাকী'।

কিন্তু হঠাৎ কী হল?

উঁচুনাকী কান্না জুড়েছে কেন? নিশ্চয় বিপদ আপদ ঘটে গেছে কিছু।

টর্চটা নিভিয়ে ফেলে বলল, 'কী ব্যাপার ঘোষ মশাই?'

ঘোষ মশাই তাঁর বাসার এই ভাড়াটেটিকে একটু প্রীতির চক্ষে দেখেন। কারণ বউ ছেলের ঝামেলা নেই, অভিযোগ অনুযোগের বালাই নেই। সারাদিন তালা ঝোলানো ঘরটার জন্যে মাসে মাসে পুরোদস্তুর ভাড়াটি দেয়। এবং সকলের আগেই দেয়। দোসরা ভিন্ন তেসরা হয় না। যেটা তাঁর এই বাকি তেরো ঘরের কাছে আশাই করা যায় না।

সুধাকে নিয়ে মাধব ঘোষের চৌদ্দ ঘর ভাড়াটে। সুধাই সেরা।

তাই সুধার প্রশ্নে মাধব ঘোষ যেন জজকে সামনে পেল। নালিশের সুরে বলে উঠল, 'এই দেখুন মশাই, অজিতবাবু সময়ে বাসায় ফেরেননি বলে অজিতবাবুর পরিবার আমাকে থানা পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন।'

'থানা পুলিশ!'

মাধবকে ভীতি প্রদর্শন?

ব্যাপারটা বুঝতে কিছু সময় লাগল সুধানাথের। তারপর—অনেকের অনেকরকম কথা, সুখদার চিপটেন এবং মলিনার কান্না থেকে সবটা বুঝে নিল পরিষ্কার করে।

অজিত যে নিত্য সন্ধ্যা ছ'টায় ফেরে, এবং আজ এখনও ফেরেনি এটা শুনে সত্যিই চিন্তা হল তার। উড়িয়ে দেবার মতো কথা নয়।

রাত্তিরভোর ঘুমিয়ে সকালে 'যা হয়, করা যাবে' এটাও যেন অসংগত ঠেকল তার কাছে। তাই প্রশ্ন করল, 'তা উনি কাজটা করেন কোথায়?'

মলিনা ভাঙা গলায় বলল, 'কুন্তল বিলাসের অফিসে।'

'কুন্তল বিলাস? বড়ো অফিস? টেলিফোন আছে?'

'তা, জানি না—' মলিনা কাতর কণ্ঠে বলে, 'তবে আপিস মস্ত বড়ো। অনেক রাত অবধি এই সব ওষুধ পত্তর তেল টেল তৈরি হয়—'

'অনেক রাত অবধি হয়—'

সুধানাথ বলে, 'আচ্ছা দেখি, যদি অবনী ডাক্তারের ডাক্তারখানাটা এখনও খোলা থাকে, টেলিফোন করার সুবিধে হয়।'

নগেনবাবু আগ বাড়িয়ে বলেন, 'সে কথা কি আর আমরা ভাবিনি হে? ভেবেছি। কিন্তু ডাক্তারখানা কখন বন্ধ হয়ে গেছে।'

সুধানাথের অবশ্য বুঝতে দেরী হয় না, ভাবনাটা নগেনবাবু এখনই ভাবলেন। তাই মনে মনে হেসে বলে, 'আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে। যদি খোলাতে পারি। কম্পাউন্ডারটা তো শুয়ে থাকে ভেতরে।'

কম্পাউন্ডার দীনবন্ধুর সঙ্গে ভাব আছে সুধানাথের। দীনবন্ধু একই রেস্টুরেন্টে খেতে যায় মাঝে মাঝে। সুধানাথ বিনা টিকিটে সিনেমা হলেও ঢুকিয়ে দেয় কখনও সখনও বন্ধু দীনবন্ধুকে। ছবি যখন 'মরে' আসে, ভীড় হয় না, তখন দামী-সিটেই বসিয়ে দেয়।

সেই যোগসূত্রের ভরসায় বেরিয়ে পড়ল সুধানাথ।

যারা 'সকাল' দেখাচ্ছিল, তারা সুধানাথের এই অর্বাচীনতাকে ব্যঙ্গ করে খেতে শুতে গেল, মাধব ঘোষ আবার সুখ-শয্যায় অঙ্গ ঢাললো গিয়ে।

শুধু সুখদা দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে রইল, শেষ মজা দেখবার জন্যে। বসে রইল মদনাকে কাছে বসিয়ে। গোলমালে ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে সে। মায়ের গায়ে ঠেকা দিয়ে বসে বসে হাই তুলছে।

আর মলিনা নিজের দাওয়ায় উঠে গিয়ে এখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

প্রতীক্ষার প্রহর অনন্ত!

মলিনার মনে হয়, সে বুঝি সারারাত ধরে কাঁদছে। মনে হয়, ওই ইয়ার ছোকরাটা নির্ঘাত মজা দেখতে থাকে বৃথা আশ্বাস দিয়ে আর কোথাও শুতে চলে গেল।

নইলে অবনী ডাক্তারের বাড়ি আবার কতদূর!

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুধানাথ যতটা সম্ভব দ্রুত গেছে। জানলায় টোকা দিয়ে দীনবন্ধুকে তুলিয়ে ডিরেক্টরি দেখে কুন্তল বিলাসের অফিসে এবং সেখানে সাড়া শব্দ না পেয়ে মালিকের বাড়িতে ফোন করে তথ্য সংগ্রহ করে, ছুটে ছুটে এসেছে।

ওকে ঢুকতে দেখেই, মলিনা চোখের কাপড় নামিয়ে ডুকরে ওঠে, 'খবর কিছু পেলে ঠাকুরপো?'

জীবনে কোনোদিন সুধানাথকে ঠাকুরপো বলেনি মলিনা। কথাই কয়েছে কি না সন্দেহ। পরস্পরের সঙ্গে কথা চালনার যে প্রধান কারণ—জল কল, সে কারণ মলিনার নেই। তাই কথাও নেই বড়ো একটা কারও সঙ্গে।

কিন্তু আজকের কথা স্বতন্ত্র। আজ মলিনা 'কারে' পড়েছে। তাই ঠাকুরপো সম্বোধনে অন্তরঙ্গ হতে চাইছে তার সঙ্গে, যে তার বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে।

'ছেলেটার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে'—ভেবেছে মলিনা।

কই, একটা মানুষও তো এক পা বেরিয়ে এক তিল চেষ্টা করতে এগোয়নি? তখন তবু সময় ছিল। এখন তো সত্যিই অসময়। এই মনুষ্যত্বযুক্ত মানুষটাকে তাই অসহায়তার দুঃখময় মুহূর্তে নিকট সম্পর্কের সম্বোধনে আঁকড়াতে ইচ্ছে করল মলিনার।

নতুন এই সম্বোধনটা সুধানাথের কানেও মিষ্টি ঠেকল। কিন্তু এখন তো ভালো লাগালাগির সময় নয়। এখন যে বড়ো দুঃসময়। 'কুন্তল বিলাসে'র মালিক যা বললেন, সে তো আরও চিন্তার কথা।

মাত্র ছ'ঘণ্টাই তাহলে সমাজে অনুপস্থিত নয় অজিত ভট্চায, তেরো চৌদ্দ ঘণ্টার হিসেব মিলছে না।

রাত দুপুরে ফোন আসাতে ক্রুদ্ধ বড়োলোক বিরক্ত ভাবে জানিয়েছেন, অজিতের অসততায় বিরক্ত হয়ে তিনি আজ তাকে কাজে জবাব দিয়েছেন। বেলা এগারোটার সময় তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে অজিত ভট্চায। তারপর তার আর কোনো খবর তিনি জানেন না। বাড়ি ফেরেনি? স্ত্রী কান্নাকাটি করছে? কি করবেন। দুঃখিত।

কটাস করে কেটে দিয়েছিলেন কানেকশান।

অসততার কথাটা উল্লেখ করল না সুধানাথ, শুধু বলল, 'কী যেন বচসা হওয়ায় মালিক নাকি

কাজে জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন সকাল বেলাই। বেলা এগারোটার সময় অফিস থেকে বেরিয়ে গেছেন।'

'ও ঠাকুরপো, কোথায় সে গেছে তবে? সারাদিন কোথায় আছে? চাকরি যাওয়ার ঘেন্নায় কিছু ঘটিয়ে বসেনি তো?'

বলে, মলিনা চেঁচিয়ে ওঠে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে যমরাজের চরম পত্রের মতো ভয়ঙ্কর বাণীটি ঘোষণা করে বসে, সুখদার হাবা ছেলে মদনা।

'ত্যাখন অ্যা—অ্যা অ্যা—তো করে ব—বললাম, দে—দেখবে তো চল। অহঙ্কার করে ব-বসে থাকা হল। এ্যা-এ্যাখন বো-বোঝ। আ-আমি তো-তোকে নিখ্‌খাত বলছি মা, ওই রে রে রেলেকাটাটা বামুন কাকা।...তে-তেমনিতর নীঃ নীঃ নীল শার্ট ছিল পরনে!...উঃ সে কী রক্ত! মু-মুখটা এ্যা... এ্যাকেবারে ছেঁচে—'

আর শোনবার ধৈর্য থাকে না মলিনার, হঠাৎ দাওয়া থেকে গড়িয়ে উঠোনে পড়ে। ঠাঁই ঠাঁই করে কপাল ঠুকতে থাকে আর পরিত্রাহি চিৎকার করতে থাকে,—'ওগো, আমি কী কাজ করেছি গো! ওগো, কেন দেখতে যাইনি গো! সেই তো ভরদুপুর সময়, চাকরি খুইয়ে বাড়ি ফিরছিল সে। নিশ্চয় মনের ঘেন্নায় লাইনে ঝাঁপ দিয়েছে—'

নিজের কপাল ছেঁচে রক্তগঙ্গা করে মলিনা।

এরপরে আর মহিলাকুল রাগ করে ঘরে বসে থাকতে পারেন না। মলিনাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করেন সমবেত চেষ্টায়। এবং কারুরই আর সন্দেহমাত্র থাকে না, সেই রেলেকাটা হতভাগ্যই—অজিত ভট্‌চার্য্য।

মিলে তো যাচ্ছে ঠিক ঠিক।

নীল শার্ট।

বেলা এগারোটা।

চাকরি খোয়ানো মন।

আর প্রমাণের দরকারটা কি?

সকলেই 'হায় হায়' করতে থাকে, তখন একবার দেখতে না যাওয়ার জন্যে, এবং পুরুষরা—যাঁরা নাকি স্ত্রীদের হুজুগে নাচা একেবারে দেখতে পারেন না, তাঁরা অভিযোগ করতে থাকেন—'এই তিন লাফের রাস্তা, একবার গেলে না কি বলে? ধন্যি, নিশ্চিন্দি মন! বলি, এ যদি আমরা হতাম!'

কিন্তু এখন কোথায় সেই দ্বিখণ্ডিত দেহ, যেখানে ছুটে গিয়ে শনাক্ত করতে যাওয়া হবে?

উন্মাদ চিৎকার আর উন্মত্ত আচরণ এক সময় স্থির হয়। মলিনাকে টেনে দাওয়ায় তুলে চোখে মুখে জল দিয়ে একজন পাখা নেড়ে বাতাস করতে থাকে।

এবং সমস্ত মহিলাকুল আপন আপন ঘর ত্যাগ করে সেই দাওয়ায় জটলা করে বসে আলোচনা করতে থাকেন, ইতিপূর্বে তাঁদের জ্ঞান-গোচরে আর কোথায় কোথায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল।

এমন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত সচরাচর তো দেখতে পাওয়া যায় না।

এঁদের দাপটে সুধানাথ সরে গিয়েছিল।

কিন্তু চোখে তার ঘুম আসছিল না। কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে বসেছিল নিজের কোটরে, চৌকিটার ওপর।

আর কেমন যেন মনে হচ্ছিল সুধানাথের, আগামী সকালের সমস্ত দায়িত্বই বুঝি তার। সেই রেলেকাটার খোঁজ করতে হবে, মলিনাকে নিয়ে গিয়ে শনাক্ত করতে হবে এবং তারপর মলিনার এই অসহায় অবস্থার উপায় চিন্তা করতে হবে।

কিন্তু সে লাশ কি ওরা রেখেছে?

হয়তো ফটো তুলে রেখে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ফটো দেখে কি বোঝা যাবে?

আচ্ছা! এই বা কী আক্কেল অজিত ভট্চাযের? বাড়ির দোরে লাইনে কাটা পড়তে এল!

কিম্বা হয়তো আত্মহত্যা নয়।

মন প্রাণ খারাপ ছিল, অসতর্কতায় হয়ে গেছে। গেট নামিয়ে দেওয়ার পরও মাথা গলিয়ে গলিয়ে লাইন পারাপার হওয়ার অভ্যাস তো সকলেরই।

শহরতলীতে যাদের বাস করতে হয় তারাই জানে, ও অভ্যাস না করতে পারলে কী অবস্থা!

যমে কামড়ানো রাতও একসময় ভোর হয়।

এ বাড়িতেও হল।

মলিনা উঠে কাঠের মতো দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে, গিন্নিরাও ঠিক করতে পারছেন না, মলিনার এখন কিংকর্তব্য!

লাশ তো চোখে দেখেনি এখনও, দেখতে পাবে তারও ঠিক নেই। সৎকার করার প্রশ্নও তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে? তার স্ত্রীর বিধবা হওয়া চলে কি? অথচ বামুনের মেয়ে। যা তা করলেও চলবে না।

নগেন গিন্নি বললেন, 'সিঁদুরটা নয় এক্ষুনি মুছে কাজ নেই, নোয়াগাছটা ফেলে দিক। একবার মাথাটা ডুবিয়ে, কাপড় ছেড়ে একঘটি জল মুখে দিক। কাল থেকে একা কেঁদে কেঁদে আহা মুখের দিকে চাওয়া যাচ্ছে না।'

তা সত্যি, সেই প্রবল কান্নার দাপটে এবং মাথা খোঁড়ায় মলিনার মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছিল। কপালে কালসিটে, শুকনো রক্তের দাগ, এবং দু' তিনটে উঁচু উঁচু ঢিবি। মুখটা ফুলো ফুলো, মুখের চামড়াটা শুকনো। মাথায় কাপড়ও ছিল না মলিনার।

ঘরের জানালা থেকেই দেখতে পাচ্ছিল সুধানাথ। কিন্তু খুব ভোরে করণীয় কি আছে? একটু বেলা না হলে তো কোথাও কাউকে পাওয়া যাবে না?

সকালের চাকরিটায় আজ আর গেল না সুধানাথ, অপেক্ষায় রইল একটু পরে ওই ওখানকার গুমটি ঘরে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার।

কিন্তু মলিনার কী হবে?

ওই মেয়েমানুষগুলো কি ওকে জ্যান্ত রাখবে?

যা সন্দেহ তাই।

ঘটনার খানিক পরেই নাকি অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি লাশ তুলে নিয়ে গেছে। এবং খুব সম্ভব এতক্ষণে সে লাশ জ্বালিয়েও ফেলেছে।

নাও ফেলতে পারে। ফটো তুলে রাখতে পারে। সব দায়িত্বই হাসপাতালের।

রেল পুলিশেরও থাকতে পারে কিছু দায়িত্ব। মোট কথা, এদের কিছু নেই! স্টেশন মাস্টার বরং মেজাজ দেখিয়ে বলেন, 'যত হতভাগার রেলে কাটা পড়ে মরতে ইচ্ছে করে! আর আমাদের হচ্ছে মৃত্যু। কেন রে বাবা, চিরদিনের দুঃখনিবারিণী মা গঙ্গা আছেন, মরতে ইচ্ছে হয় তো সেখানে ঝাঁপ দিয়ে মরগে যা না! তা নয়, নিজে রক্তগঙ্গা হয়ে মরব।'

'আত্মহত্যা, না অসাবধান?'

'তা কী করে জানব মশাই। ইঞ্জিন তেড়ে আসছে, অথচ বাবুরা দিব্যি বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে লাইন পার হচ্ছেন, এতো হরদম দেখি। বেড়াতে যাচ্ছে, না সুইসাইড্ করতে এসেছে, কে বুঝবে?'

ওঁর বক্তৃতা থামিয়ে সুধানাথ অনেক কষ্টে হাসপাতালের ঠিকানাটা সংগ্রহ করে। কিন্তু জেরার মুখে পড়তে হয় তাকে কম নয়।

মৃতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, কি নাম মৃতের, গতকাল থেকে এতক্ষণে খোঁজ নেবার সময় হল? বাড়ি থেকে রাগ করে বেরিয়েছিল কি না, আত্মহত্যার কোনো কারণ ছিল কি না, ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবং বহু ঘাটের জল খেয়ে সুধানাথ যখন মড়ার গাদার কাছে পৌঁছল তখন ফটো তোলা পর্ব সেরে, বেওয়ারিশ বলে জ্বালাতে নিয়ে যাচ্ছে।

সুধানাথ চিনতে পারল না।

সুধানাথ পচাগন্ধে ঠিকরে বেরিয়ে এল লাশঘর থেকে। শুধু অনেক অনুনয় বিনয়, এবং কিছু সলিড জিনিস সাপ্লাই করে কাজটা একটু স্থগিত রাখবার ব্যবস্থা করে, ট্যাক্সি ভাড়া করে মাধব ঘোষের বাসায় ফিরে এল।

মলিনাকে নিয়ে যেতে হবে!

কাজটা যত নৃশংসই হোক, না করে উপায় নেই।

কিন্তু একা যাওয়া ঠিক নয়।

সময় যেমনই হোক, সমাজ তার পাওনা ছাড়ে না। এই মাধবের বাসার তেরো ঘরের ঘরণী—নিশ্চয়ই এখুনি নিন্দায় মুখর হয়ে উঠবে, যদি সুধানাথ আর মলিনা এক ট্যাক্সিতে চড়ে ওদের নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

অতএব খোসামোদ করতে হবে ওদের!

বলল সুধানাথ, 'আপনারা কেউ চলুন।'

দাস গিন্নি ফিসফিসিয়ে হেসে নগেনবাবুর স্ত্রীকে বললেন, 'ঠাকুরপোর যে দরদ উথলে উঠেছে! নিজের কাজ ছেড়ে মাথায় সাপ বেঁধে ঘরে বেড়াচ্ছে সকাল থেকে। এখন আমায় বলছে লাশ শনাক্ত করতে সঙ্গে যেতে। আমি কখন যাব দিদি?'

দিদি বললেন, 'আমারও বাবা মরবার সময় নেই। তা ছাড়া, ওসব শুনলেই ভয় করে।'

কমবয়সীদের তো কথাই ওঠে না, গিন্নিরাই জবাব দিলেন।

অবশেষে সুখদা।

যে সুখদাকে কাল দুপুরে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে তাড়িয়েছিল মলিনা।

কিন্তু এখন আর মান অপমান জ্ঞান নেই মলিনার। ক্রমশই যেন কেমন জবুথবু হয়ে যাচ্ছে সে।

গত রাত্রের সেই উন্মত্ত শোকের মধ্যেও তবু 'মলিনা' নামক মানুষটাকে চিনতে পারা যাচ্ছিল, আজ যেন সে মলিনা হারিয়ে গেছে।

তাই সুখদা যখন বিজয় গৌরবে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে সশব্দ স্বগতোক্তি করল, 'আমারই হয়েছে মরণ! এই তো, সবাই গা ঝাড়া দিয়ে নিজের সংসার নিয়ে বসে রইল, আমি পারলাম? আপুক্ষতি করেও চললাম। কই বললাম কি, 'তুমি আমায় পোঁছ না, তুমি আমায় দূরছাই কর, তোমার অসময়ে আমি দেখব কেন?' তখনও চুপ করেই থাকল মলিনা।

সুধানাথ বলল, 'আর থাক, এসময় ওসব কথা থাক।'

সত্যিই, সুখদার অনেক কাজের ক্ষতি হল।

অনেক বেলায় ফিরল ওরা।

মাধব ঘোষ নিজেই মদনার সাহায্যে একটা চালে ডালে পাক করে নিয়ে খেতে বসেছে। মদনাকেও খাইয়েছে তার আগে।

সুখদা এসে আপসে পড়ল, 'ঠিক বলেছিল মদনা! একেই বলে কাঙালের কথা বাসি না হলে মিষ্টি হয় না।...দেখলাম, বামুন ছেলেই! মুখ চেনবার উপায় না থাকলেও অঙ্গ আকৃতি দেখলে তো বোঝা যায়?'

'উনি কি বলেন?'

মাধব ঘোষ খিচুড়ির গরম সাপটে প্রশ্ন করল!

এবং একা মাধব ঘোষই নয়, মলিনাকে বাদ দিলে, বারো ঘরের যতজন ছিল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওই একই প্রশ্ন করল, 'মলিনা কি বলল?'

সুখদার আজ পদমর্যাদা রাষ্ট্রপতি সদৃশ। সুখদা তাই মুখ চোখের যত রকম ভঙ্গি করতে সে জানে, সব করে নেয় এবং ফিসফিসে গলায় বলে, উনি? 'উনি হচ্ছেন ধূর্ত মেয়ে মানুষ। উনি স্বীকার পেলেন না। বললেন, 'বুঝতে পারছি না।' বললেন, 'এ রকম জামাকাপড় নয়।' নাকে কাপড়ে দিয়ে সরে এলেন। আরে বাবা! রক্তে ভিজে জামা কাপড়ের আর চেহারা আছে কিছু?—তা কেন, বুঝছ না? স্বীকার পেলেই তো এক্ষুণি সব গেল। শাড়ি, চুড়ি, নোয়া, সিঁদুর। তার থেকে 'বুঝতে পারলাম না' বলে নিলেন। চুকে গেল ল্যাঠা। এখন চিরজন্ম আর কেউ এয়োতি কেড়ে নিতে পারবে না!'

মলিনার এই ধূর্তামিতে সকলেই বিরক্ত হল। এবং কোনো মজা দেখা গেল না বলে হতাশ হল। মলিনা শুয়ে পড়ে রইল ঘরের মেঝেয়। কেউ আর সান্ত্বনা দিতে এল না।

যে মেয়েমানুষ বিধবা হয়েও চালাকীর জোরে বৈধব্য এড়িয়ে বসে থাকে, তাকে আবার সান্ত্বনা কি?

বিকেলের কাজটায় যেতেই হয়।

অস্নাত, অভুক্ত সুধানাথ দাস গিন্নির কাছে এসে বলে, 'আমাকে তো বেরোতে হচ্ছে। ওঁকে আপনারা বলে কয়ে একটু জল অন্তত খাওয়ান।'

দাস গিন্নি ক্ষুব্ধ হাস্যে বলেন, 'তুমিই কেন একটু খাইয়ে গেলে না ভাই। তোমার কথা বরং শুনতো। আমাদের কথা কি নেবে?'

সুধানাথ এই সাদাসিধে কথাটার মধ্যে যেন আঁসটে আঁসটে গন্ধ পেল।

তাই সুধানাথ গম্ভীর হয়ে গেল।

গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনাদের কথা নেবেন না, আমার কথা শুনবেন, এটা কি বলছেন আপনি? আমার সঙ্গে পরিচয় বা কতটুকু? বলতে গেলে কালই প্রথম কথা বলেছি ওঁর সঙ্গে।'

দাস গিন্নি অমায়িক গলায় বলেন, 'দিন, ঘণ্টা, মাস দিয়ে কি আর পরিচয়ের ওজন মাপা যায় ভাই? একদিনের পরিচয়েও চিরদিনের আপন হতে পারে। তুমি ওর অনেক করলে, কৃতজ্ঞ হয়েও তো ও—'

'আমি এমন কিছুই করিনি। মানুষ মাত্রেই এটুকু করে—' বলে বেরিয়ে যায় সুধানাথ।

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে তার। কিন্তু শুধুই কি সেইদিন? প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত?

কিন্তু কার কি এসে যায় যদি সব সময় সুধানাথের সর্বাঙ্গ জ্বলে? সেই রাগটা বরং এদের হাসির খোরাক।

'ঠাকুরপোর দরদ' আখ্যা দিয়ে সুধানাথের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়।

দিন গড়িয়ে যায়।

বেশ কয়েকটা দিন।

যাবেই।

দিনের পর রাত, এবং রাতের পর দিন আসবেই। আর যে কোনো ধরনেরই অবস্থা হোক, মানুষ এক সময় উঠবে, হাঁটবে, নাইবে, খাবে।

মলিনাও উঠেছে।

নাইছে, খাচ্ছে।

ক'দিন বেশি ভাড়ার ভাড়াটের গৌরব নিয়ে আলাদা কলতলায় নাইবে? মাসটা শেষ হলেই তো বিরাট একটা দৈত্য হাঁ করে দাঁড়াবে।

মলিনা মাছ, মাংস খায় না, কিন্তু মলিনা লোহা, সিঁদুরও ফেলেনি। মলিনা যেন ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলছে। এর চাইতে অজিত যদি স্পষ্টাস্পষ্টি মারা যেত, মলিনা বুঝি স্বস্তি পেত!

কিন্তু অজিত তো স্পষ্ট মারা গেল না! অজিত যেন একটা ধূসর শূন্যতায় হারিয়ে রইল। সুখদা জোর গলায় বলেছে, 'ও-ই অজিতের লাশ,' কিন্তু মলিনার মন নেয়নি।

যতই বিকৃত হোক, ওই হাত পা কি অজিতের?

সুখদা বলেছিল, 'ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে গেছে, এখন তুমি হাত পায়ের গড়ন খুঁজছ?'

কিন্তু না খুঁজলে কোন্ খুঁটিটাকে চেপে ধরবে মলিনা?

মলিনা ভগবানের কাছে শতবার নালিশ জানায়, স্পষ্ট কেন বুঝিয়ে দিলে না ঠাকুর! সে যে আমার শতগুণ ভালো ছিল। রাজ্যসুদ্ধ মেয়েমানুষ বিধবা হচ্ছে, আমিও হতাম। এ তুমি আমাকে কী করে রাখলে?

অথচ ওই গিন্নিগুলোর কথা শুনে, বিধবা মূর্তি করে, অজিতের নামে পিণ্ডি দেবে, সেও যে কিছুতেই মন সায় দেয় না।

তাই ঘর থেকে আর সহজে বেরোচ্ছে না মলিনা, কোনোমতে আড়ালে আড়ালে কাটাচ্ছে।

মাসের প্রথম দিকে হারিয়ে গেছে অজিত, আর ঠিক তার আগের দিনই মাসকাবারী বাজারটা করেছিল। সুধানাথ এক ফাঁকে, কোনো সময়, দাওয়ায় দুটো আলু পটল রেখে যায়, দিনান্তে একবার উঠে মলিনা দুটো ভাতেভাত ফুটিয়ে নেয়। বাকি সময় শুয়ে থাকে।

এই বারো ঘরের ঘরণীদের কাছে সে যেন একঘরে হয়ে গেছে।

ওর ওই বিধবা না হবার জেদ, আর সুধানাথের ওকে দেখাশোনা, ওদের চক্ষুশূল। আর এঁদের রূঢ় মন্তব্য ও হৃদয়হীন ঔদাসীন্য, মলিনার যেন মর্মান্তিক লাগে।

প্রতি মুহূর্তে উঠে পালাতে ইচ্ছে হয় মলিনার।

তার সেই গর্ব, সেই অহঙ্কার, সব বিসর্জন দিয়ে এভাবে পড়ে থাকা কি সহজ?

তাছাড়া—

পড়ে থাকতেই বা ক'দিন দেবে মাধব ঘোষ? ও মাসের দোসরা হলেই তো এসে হয় ভাড়া চাইবে, নয় নোটিশ দেবে!

কিন্তু আশ্চর্য! দশ, বারো, পনেরো তারিখ হয়ে গেল, মাধব ঘোষ না দিল নোটিশ, না চাইল ভাড়া। একবার করে যখন এদিকে এসে মলিনার তত্ত্ব নিচ্ছিল, তখন মলিনা অস্ফুটে বলেছিল, 'আপনার— ভাড়াটা—'

মাধব ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, 'থাক, থাক, ও নিয়ে এখন আর তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। আমি তো আর পিশাচ নই!'

মলিনা ভেবেছিল, পিসাচের আবরণেও তা হলে 'মানুষ' থাকে। এই সব ভালো লোকেরা এই ব্যবহার করছেন, অথচ চিরদিনের অর্থপিশাচ মাধব ঘোষ—

কিন্তু এ কী জীবন হল মলিনার!

মাধব ঘোষ দাক্ষিণ্য করে বাসার ভাড়া নেবে না, কে কোথাকার সুধানাথ দয়া করে দুটো বাজার করে দিয়ে যাবে, আর মলিনা একবেলা তাই ফুটিয়ে খাবে, আর বাকি সময় মেঝেয় পড়ে পড়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করবে?

আর কিছু নেই?

ভবিষ্যৎ বলে একটা বস্তু অজিতের মতোই ধূসর হয়ে থাকবে?

তা ছাড়া, একঘরে হয়ে থাকার মতো কষ্ট আর কি আছে?

স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মলিনা যে একসময় নিজেই ওদের হেয় জ্ঞান করে ওদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতো, সে আর এখন মনে পড়ে না মলিনার।

ওরা যে রাঁধছে, বাড়ছে, খাচ্ছে, বেড়াচ্ছে, ছেলে ঠেঙাচ্ছে— এক কথায় জোর কদমে সংসার করছে, অথচ কদাচিৎ মলিনার ঘরে উঁকি মারছে না, এতো শুধু কষ্টেরই নয়, অপমানেরও।

আসে, এক আধবার স্বপনের মা আসে।

বলে, 'মলিনাদি, চৌকিটায় শুলে তো পারো। রাতদিন মাটিতে শুয়ে শুয়ে রোগে ধরলে দেখবে কে?'

বলে, 'বুঝলে মলিনাদি, গিন্নিরা সব তোমার ওপর খাপ্পা। এই যে আমি একটু এসেছি, তা সব ভালো চক্ষে দেখে না।'...

আবার এ কথাও বলে, 'সুধানাথবাবুর সঙ্গে বুঝি তোমার আগেকার চেনাজানা ছিল ভাই?'

মলিনা কোনো কথারই উত্তরই দেয় না।

মুখরা মলিনা যেন মূক হয়ে গেছে।

কিন্তু মলিনাকে আরও মূক করে দেবার মতো আরও এক ঘটনা ঘটল।

একটা মুটে এসে মাসকাবারি বাজার এনে মলিনার দাওয়ায় নামাল। চাল, ডাল ফুরিয়ে এসেছিল। দু'জনের ভাগ একজনে খেলেও, এসেছিল। একমাস যে দু'মাসে ঠেকতে বসেছে। ফুরিয়ে এসেছিল, মলিনা ভাবছিল, না খেয়ে মরা যায় না? মন্দ কি, যদি মলিনা সেই পদ্ধতি ধরে?

হঠাৎ—এই সময় এই।

মলিনা বলল, 'তুমি ভুল করছ। এ ঘর নয়।' মুটেটা বলল, 'এই তো সাত নম্বর ঘর! চিঠি আছে।'

বাড়িয়ে ধরল একটা কাগজ।

চিঠি আছে।

এ কি অদ্ভুত কথা!

মলিনার চিঠি আছে। যে মলিনার তিনকুলে একটা 'মাসি' বলতে নেই, এতবড়ো দুর্ঘটনা ঘটে গেল, মলিনার কোনো কুল থেকে কেউ খবর নিতে এল না, তাকে আবার চিঠি কে দেবে?

দেখেশুনে আর ঘরেরা তো এমন সন্দেহও প্রকাশ করছে, বিয়ে করা স্বামী-স্ত্রী তো? না কি ঘর ভেঙে বেরিয়ে আসা? তিনকুলে কেউ নেই, এমন হয়?

কিন্তু হয়েছে।

সত্যিই কেউ নেই। আর যদিও সুদূরে কেউ থেকে থাকে, মলিনা তো তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি। আজ মলিনা তাই চিঠি আছে শুনে নিথর হয়ে গেল।

হে ঈশ্বর, এমন হয় না যে, এ চিঠি অজিতের!

দুষ্টুমী করে কোথাও লুকিয়ে বসেছিল। এখন খেয়াল হয়েছে মলিনার চাল, ডাল ফুরিয়েছে, তাই সব কিনে কেটে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে।—'মলিনা, আমি অজ্ঞাতবাসে আছি, কিন্তু তোমার বাজারটার চিন্তায় শান্তি নেই। তাই—'

কল্পনাটুকু মুহূর্তের।

কাগজের টুকরোটুকু খুলে ধরল মলিনা। লেখা রয়েছে, 'আপত্তি করবেন না। বাঁচতে তো হবে।'

সুধানাথ মিত্র

বাঁচতে তো হবে!

আশ্চর্য, আজও পৃথিবীতে এমন কেউ রয়েছে, যে মলিনার বাঁচার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। সেই বাঁচার জন্যে রসদ জোগান দিতে আসছে।

নিশ্বাস ফেলে বলল, 'নামিয়ে দাও।'

এরপর আর নগেন গিন্নি, দাস গিন্নি, মণ্ডল গিন্নির নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব হল না। ওঁরা এলেন দাঁত খুঁটতে খুঁটতে, ভিজে কাপড় নিংড়োতে নিংড়োতে।

'বাজার কে করে দিল? সুধাবাবু বুঝি? তাই ভাবছি উনিই তো দেখাশোনা করছেন। আমরাও তাই নিশ্চিন্দি আছি। একজন যখন সমগ্র ভার নিয়েছে—'

মণ্ডল গিন্নি বলেন, 'সুখদাদি চেপে গেল, ভাব দেখাচ্ছে যেন ঘোষ মশাই অমনি থাকতে দিয়েছেন। কিন্তু ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। সুধাবাবুই নাকি এ ঘরের ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছেন। তাই ইনি বলছিল, 'তোমরা আর অজিতবাবুর বউয়ের কথা নিয়ে মন খারাপ করছে কেন? অজিতবাবু নেই, সুধাবাবু তো তার বাড়া করছেন।' আচ্ছা, তা মলিনা, মাছটা কেন খাওনা? সবই যখন রেখেছ—'

মলিনার প্রতিজ্ঞা মলিনা মুখ খুলবে না। তাই মলিনা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। শুধু মনে মনে বলে, 'এ সন্দেহ আমার হয়েছিল, তবুও জোর করে ওই অর্থ পিশাচটাকে দেবতা ভাবছিলাম। কিন্তু এ আমি কোথায় চলেছি?...কেন নিচ্ছি এত? এ ঋণ আমি শোধ করব কি দিয়ে!'

রাত্রে শুয়ে আকুল হয়ে বলে, 'তুমি কি সত্যিই আর আসবে না?...তুমি কি সত্যিই জন্মের শোধ চলে গেছ? সুখদার চোখই নির্ভুল?...আমি আসার ছলনায় ভুলে ভুল দেখেছি! তাই ওরা আমায় একঘরে করে রেখেছে, আমায় ঘেন্না করছে।...কিন্তু আমি ওদের চোখের সামনে এই ভাবে কি করে কাটাব?'

অনেকক্ষণ ভেবে মলিনা ঠিক করল বামুনের মেয়ে, রাঁধুনী বৃত্তি ধরবে। এভাবে দয়ার অন্ন খাওয়ার চেয়ে চাকরি করে খাওয়া ভালো।

তাতে পেটের ভাত জুটবে, ঘরের ভাড়াও হবে।

লজ্জা করবে?

মাথাকাটা যাবে?

তা প্রথম প্রথম হয় তো যাবে। তারপর সয়ে যাবে।

কিন্তু 'স্বামী নিরুদ্দেশ' এই পরিচয় কি সমাজে মান্য? কথাটা যেন হাস্যকর। তার থেকে ওদের মনস্কামনাই পূর্ণ হোক। মলিনা বিধবার সাজ সেজেই—

শেষটা আর ভাবতে পারল না মলিনা। চোখের জলে একাকার হয়ে গেল।

এঁরাও তেমন সুখ পেলেন না।

মলিনা যদি প্রতিজ্ঞা করে থাকে একেবারে কথা কইবে না, কত আর এগোনো যাবে?

এক উপায় আছে, মাধব ঘোষকে দিয়ে বলানো, 'ভদ্র বাড়িতে এসব অনাচার চলবে না।'

অনাচার ছাড়া আর কি? একটা লোক অপঘাতে মরল, আর মরতে না মরতে বাসার আর একটা লোক তার পরিবারকে নিয়ে নিল, এর মতো অনাচার আর কি আছে?

তা নিয়ে নেওয়া ছাড়াই বা আর কি?

খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, ঘরভাড়া দিচ্ছে, বাকিটা কী? শেষ যা হবে তা তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে। নেহাত পাঁচজনের চোখের সামনে তাই, নইলে এতদিনে সবই হত।

এই কথাই বোঝাতে হবে মাধবকে।

ভাড়াটে গেলে ভাড়াটে হবে না, সে ভয় তো আর নেই এ যুগে? বরং বেশি ভাড়ায় ভাড়াটে আসবে। এই স্বভাবচরিত্রহীন ছেলেটাকে আর মলিনাকে নোটিশ দিক মাধব ঘোষ।

আক্রোশ মেটাবার এই চরম উপায় আবিষ্কার করে এরা।

আক্রোশ?

তা আক্রোশ নয় কেন? দুঃখে পড়ল, অথচ দুঃখী হল না, এ মেয়েমানুষকে কখনও চোখের ওপর সহ্য করা যায়?

দাস গিন্নি ভেতরে ভেতরে দুটো ভাড়াটেও ঠিক করে ফেললেন মাধব ঘোষের। তারপর পাড়লেন কথাটা।

রাত ছাড়া দেখা হয় না।

মলিনা তখন সুধানাথের কাছে এসে চাকরি জুটিয়ে দেবার দরবার করছিল। টর্চ নিভিয়ে চাবির মোচড় দিয়ে দরজাটা সবে খুলেছে সুধানাথ, পিছন থেকে মলিনা বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে ঠাকুরপো।'

সুধানাথ থমকে তাকাল।

তারপর বলল, 'বলুন।'

সুধানাথের ঘরে লাইট নেই। মলিনার ঘরে আছে। সেই লাইটের কিয়দংশ এসে এ দাওয়ায় পড়েছিল। আর মলিনার ঘরটা যে খালি, তা খোলা দরজা দিয়ে দেখা দিচ্ছিল।

সুধানাথের অস্বস্তি হচ্ছিল।

তবু বলল, 'বলুন।'

মলিনা বলল।

সুধানাথ চমকে বলল, 'চাকরি? কি চাকরি?'

'তা আমি কি আর আপিসের চাকরি চাইছি? বামুনের মেয়ের যাতে লজ্জা নেই, সেই কাজই করব। একটা রাঁধুনীর কাজ তুমি আমায়—'

কথা শেষ হবার আগেই মাধব ঘোষের শ্লেষ্মাজড়িত ভারী গলার আওয়াজ বেজে উঠল। 'সুধানাথবাবু, ভেবেছিলাম কিছু বলব না। কিন্তু না বলেও তো পারছি না। মাধব ঘোষের বাসাটা বিন্দাবন নয়, বুঝলেন? এই আপনাকে আমি নোটিশ দিচ্ছি—তিনদিনের মধ্যে আপনার ওই বান্ধবীকে নিয়ে এই বাসা ছেড়ে সরে পড়বেন।'

সুধানাথ গম্ভীরভাবে বলে, 'তিনদিনের নোটিশ দিচ্ছেন? বাড়িভাড়া আইনটা বুঝি আপনার জানা নেই?'

মাধব ঘোষ অবশ্যই এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল, এবং উত্তরও জুগিয়ে রেখেছিল, তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'জানব না কেন? খুব জানা আছে। আবার হাটে হাঁড়ি ভাঙবার কায়দাও জানা আছে। কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত করে যদি থাকতে চান তো থাকুন, তবে অজিতবাবুর পরিবারের মতন খারাপ স্ত্রীলোক আমার বাসায় রাখলে, এরপর আমার ভদ্দর ভাড়াটেরা চলে যাবে। সেই কথাটাই ওঁকে জানিয়ে দেবেন।'

মাধব ঘোষ চলে যায়।

বেশ গট গট করেই যায়।

সমস্ত ঘরের দরজা-জানালা যে ঈষৎ উন্মুক্ত তা দেখতে তার বাকি থাকে না। বোঝে কাজটা সুচারু হয়েছে।

মলিনা?

সে বোধ করি, আজকাল নিতান্ত শক্ত হয়ে গেছে বলেই সহজভাবে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে।

তিনদিন পরে নয়।

পরদিনই, সুধানাথের যখন কাজের সময়, তেমন অনর্থকালে একটা ঠেলাগাড়ি এসে মাধব ঘোষের বাসার দরজায় দাঁড়াল।

সুধানাথও এল। খুব সম্ভব ছুটি নিয়েছে। নিজের যৎকিঞ্চিৎ জিনিস ঠেলায় তুলে, এঘরে এসে নেহাত সহজভাবে বলল, উঠুন, একটু ঠিক হয়ে নিন, জিনিসপত্রগুলো তুলিয়ে ফেলি—'

মলিনা মিনিটখানেক চুপ করে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার সঙ্গে যাব?'

'যাবেন না তো কি ওই চামারটার মধুর বাক্য শোনবার জন্যে পড়ে থাকবেন?'

'কিন্তু এতে তো ইচ্ছে করে আরও বদনাম মাতায় তুলে নওয়া।'

সুধানাথ গম্ভীরভাবে বলে, 'উপায় কি? বদনামও রইল—অপমানও রইল, সে অবস্থার চেয়ে তো ভালো। যেখানেই নিয়ে যাই আপনাকে, অন্তত প্রতিক্ষণ অসম্মানের মধ্যে তো থাকতে হবে না?'

মলিনা আর একবার স্থির চোখে চেয়ে নির্লিপ্ত কঠিন গলায় বলে, 'কিন্তু তোমার মতলবই যে খারাপ নয়, তা বুঝব কি করে?'

সুধানাথ একটু থমকাল।

তারপর সামান্য হেসে বলল, 'সেটা তো একদিনে বোঝা যায় না? বুঝতে সময় লাগে। ধীরে ধীরেই বুঝবেন। এখন চলুন তো।'

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া মলিনা চৌকির ওপর আছড়ে পড়ে কেঁদে ওঠে, 'এ বাসা ছেড়ে আমি যেতে পারব না ঠাকুরপো, ও তাহলে জন্মের শোধ মুছে যাবে, সত্যি করে হারিয়ে যাবে।...এই ঘরের সর্বত্র ও রয়েছে। এইখানে শুয়েছে। এইখানে বসেছে—'

কান্নার শব্দে এদিক-ওদিক থেকে উঁকি পড়ে। সুধানাথ টের পায়। সুধানাথ শান্তস্বরে বলে, 'মানুষকে এর চাইতে আরও অনেক কঠিন কাজ করতে হয়। সেই ভেবে স্থির হোন। আপনি 'যাব না' বললেও তো হবে না। মাধব ঘোষ তো ওর পুণ্যের বাসা থেকে পাপপক্ষীদের উড়িয়ে ছাড়বে।'

মলিনা উঠে দাঁড়ায়।

মলিনা ভাবে, যাব না বলে জেদ করছি? কোথায় থাকতাম আমি, যদি ও ঘরের ভাড়া দিয়ে দিয়ে আমার বাসা বজায় না রাখত।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুকের পাঁজর গুঁড়োনো দেখে মলিনা। মুটেগুলো রূঢ় কঠিন হাতে হিড় হিড় করে টানতে থাকে চৌকি, বাক্স, বাসন, বিছানা, শিশি-বোতল, ভাঁড়ারপত্র।...যে সব বস্তু দিয়ে প্রাণতুল্য করে গুছিয়ে ছিল মলিনা এই তার বাসাকে।

অজিত আর তার।

কত টুকিটাকি সৌখিন জিনিস, কত স্মৃতিবিজড়িত জিনিস!

একখানা ঘরে এত জিনিসও ছিল!

আবার কোন্ ঘরে এত সব ভরবে? অজিত কেন এমন করল?

মলিনার সঙ্গে কোন্ জন্মের শত্রুতা ছিল তার?

কিন্তু অজিত ভট্চায্ নামের সেই মানুষটা, যার জন্যে মলিনা নামের মেয়েটার জীবন মিথ্যে হয়ে গেল, সে কেন সেদিন বাড়ির দরজায় এসে রেল লাইনে মাথা দিয়েছিল?

কেন?

মলিনার সঙ্গে সত্যিই কোনো শত্রুতা ছিল নাকি তার?

না কি সত্যিই পূর্ব জন্মের? সেই পুরনো আক্রোশ মেটাবার এই পথটাই দেখতে পেয়েছিল সে।

অথচ মনে তো হত মলিনা তার পরম নিধি। মলিনার কষ্ট বাঁচাতে, মলিনাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে, সধ্যের অতিরিক্ত করেছে ওই অজিত ভট্চায্।

এই বারো ঘরের ভাড়াটেদের মধ্যে মলিনা যে সকলের থেকে 'বাবু বাবু' আর উঁচু পর্যায়ের ছিল, সেতো শুধু অজিত ভঠ্চাযের ওই আপ্রাণ চেষ্টার ফলেই? নইলে দাসকর্তা ওর চেয়ে অনেক অনেক বেশি রোজগারী। মণ্ডলকর্তাও কিছু কম নয়।

তবে হ্যাঁ, এরা যে নিঃসন্তান সেটাও এদের শৌখিন আর বাবু বাবু হয়ে থাকার সহায়ক।

আর নিঃসন্তান বলেই হয়তো বিয়ের এতদিন পরেও ওদের দু'জনের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ আর আবেগ ছিল জোরালো।

নববিবাহিতসুলভ রঙ্গরস, খুনসুটি ঝগড়া, মান অভিমানও ছিল ওদের হয়তো এই জন্যেই।

তুচ্ছ কোনো কারণে কথা কাটাকাটি হয়ে হয়তো রাত থেকে কথা বন্ধ, অজিত কর্মস্থলে যাত্রাকালে বলে যেত, 'এই চললাম আর ফিরব না। নিশ্চিন্তে থাকবে।'

মলিনা মনে মনে 'দুর্গা দুর্গা' বললেও মুখে গাম্ভীর্য অটল রাখতো।

কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞার দিনের সন্ধ্যাবেলাটাই হয়তো দেখা যেত, মলিনা বিকেল থাকতেই রান্না সেরে অজিতের প্রিয় কিছু জলখাবার বানিয়ে, পরিপাটি সাজসজ্জা করে বসে আছে। আর অজিত বাড়ি ঢুকছে হয় এক ঠোঙা ডালমুট আর এক ভাঁড় রাবড়ি হাতে করে। নয় রেস্টুরেন্টের চপ কাটলেটের গোছা নিয়ে।

কখনও কখনও বা দু'খানা নাইট শোর সিনেমার টিকিট।

সিনেমা গেলে অজিত আর মলিনা নাইট শোতেই যেত। মলিনা বলত, 'এই বেশ বাপু, এসেই টুপ করে শুয়ে পড়লাম, আর কোনো ঝামেলা রইল না।'

মলিনা কোনো ঝামেলা পছন্দ করতো না বলেই কি ভগবান তাকে এই ভয়ঙ্কর একটা নিশ্চল শূন্যতার মধ্যে ফেলে দিলে?

তা ঝামেলা তো সত্যিই কিছু নেই আর। একটা লোক যদি স্বেচ্ছায় এবং বিনা শর্তে মলিনার দায় নিজের কাঁধে তুলে নেয়, মলিনার কী ঝামেলা রইল?

কিন্তু অজিত ভট্চায কি একথা জানতো? জানতো, ওই তালা লাগানো পড়ে থাকা ঘরটার মালিক, নরলোক যাকে দেখতে পায় না বললেই হয়, সে এসে অজিত ভট্চাযের স্ত্রী মলিনা ভট্চাযের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে?

তাই অজিত ভট্চায হঠাৎ কর্পূরের মতো উবে গেল?

কিন্তু কি দরকার ছিল তোর এসবে?

কি দরকার ছিল ওই মাধব ঘোষের ভাড়াটে হয়েও তোর বউকে কুন্তলবিলাস মাখাবার? কি দরকার ছিল তাকে রুটি কুমড়োর ঘণ্টর বদলে পরোটা ডিমের ডালনা খাওয়াবার? তুই একটা কবরেজের দোকানের 'প্যাকার' মাত্র। তোর বউকে তুই তাঁতের ডুরে পরাবি কিসের জন্যে?

এটাকেই তুই ভালোবাসা ভেবেছিলি?

অথচ তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারতিস এটা ভালোবাসা নয়। মোক্ষম অনিষ্ট করা।

তা তেমন করে তলিয়ে দেখতে ক'জন পারে?

অজিত ভঠ্চায তো কোন্ ছার।

বোধ বুদ্ধি হবে কিসে? ম্যাট্রিকটাও তো পাস করেনি, বার দুই ফেল করে ওই চাকরিটা জুটিয়ে ফেলেছিল।

আর বিয়েটাও করে ফেলেছিল সেইটুকুর ওপরই নির্ভর করে।

মা-বাপ মরা মলিনা দূর সম্পর্কের কাকার বাড়িতে জুতো সেলাই চণ্ডীপাঠ করে মুক্তির জন্যে ছটফটাচ্ছিল, কবরেজের দোকানের প্যাকারও তার কাছে মুক্তিদাতার মূর্তিতেই দেখা দিল। ওকে পেয়েই সুখী হল মলিনা।

আর তাইতেই সে যেন 'সুখী সুখী' হবার অধিকারও পেল।

তা ওকে ওই সুখীর ভূমিকাতেই প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্যে অজিত ভট্‌চায মনিবের জিনিস না বলে চেয়ে নেবার সহজ পথটা বেছে নিয়েছিল। শেষরক্ষা হল না। মলিনা নামটাকে আছড়ে ভেঙে দিয়ে চলে গেল এক অজানালোকে।

বাসাটা জোটা আশ্চর্যি!

একালে কেউ ভাবতেই পারে না, একদিনে বাসা জোগাড় হয়। কিন্তু রাগের চোটে বোধ করি অনেক অসাধ্যসাধনই হয়।

একে ওকে বলতে বলতে হঠাৎ একজন বলল, 'বাসা আছে একটু দূরে, রোজ এতটা আসা যাওয়া করতে পারবে?'

সুধানাথ বলল, 'না পারলে চলবে কেন? লোকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছে।'

'তা পুরনো বাসার কি হল?'

'ঝগড়া হয়ে গেছে।'

শহরতলীর আর এক কোণ!

তা হোক, যতটা দূর বলেছিল তত কিছু নয়। ছোট্ট বাড়ি, সস্তায় তৈরি। বাড়ির গায়ে পলস্তারা পড়েনি জীবনে।

তবু দোতলা!

নীচের তলায় একখানা, দোতলায় একখানা ঘর।

দোতলায় বাড়িওলা আর বাড়িওলা-গিন্নি থাকেন। একতলার ওই ঘরখানি থেকে কিছুটা আয় করেন।

ভাড়া যখন নিতে গিয়েছিল, গিন্নি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'বলছ তো বোন আছে সংসারে, তা একখানা ঘরে থাকবে কি করে?'

সুধানাথ বলল, 'বোনই থাকবে, আমি অন্যত্র থাকব, দেখাশোনা করে যাব। এই জন্যেই তো আপনাদের মতো একটি আশ্রয় চাইছি।'

গিন্নি মনে মন বললেন, 'কি জানি, কেমন ধারা বোন!' মুখে বললেন, 'বড়ো বোন?'

'না, ছোটো। পিঠোপিঠি'।

'বিধবা?'

'একরকম বিধবাই। স্বামী নিরুদ্দেশ।'

গিন্নি মনে মনে বলেন, 'স্বামী নিরুদ্দেশ কি তোমরাই নিরুদ্দেশ, তোমরাই জানো। কলিতে কাউকে বিশ্বাস নেই। বোন বললেই বোন।'

মুখে বললেন,—'শ্বশুরবাড়িতে কেউ নেই?'

'থাকলে আর আমার এত জ্বালা!'

'মা বাপ?'

'অনেককাল পাট চুকেছে।'

'বোনের ছেলেমেয়ে আছে?'
'নাঃ! ভাগ্যিস নেই, তাহলে আমি তো মরেই যেতাম।'
'হুঁ! তা তুমি বে-থা করনি?'
'কই আর করতে পেলাম? সামান্য চাকরি, বোনকে পুষতে হয়।'
কর্তাকে জানালেন গিন্নি।
কর্তা বললেন—'মরুক গে। ছেলেটা তো থাকবে না বলছে—'

গাড়িতে আসতে আসতে মলিনা একবার জিগ্যেস করেছিল, 'কী পরিচয় দিলে?'
'বলে দিলাম বোন! ওটাই ভালো। বউদি-টৌদি অনেক ঝামেলা। তবে মুশকিল এই—ছোটো বোন বলে বসে আছি। এখন আপনার তো আমাকে 'দাদা' বলতে হয়।'
'সেটা খুব শক্ত নয়। তুমিই আমাকে 'আপনি' বলে বসবে, এই যা।'
'সেরেছে! ওটা তো মাথায় আসেনি। বুড়ির যা জেরা, বাবাঃ! জেরার মুখে যা মুখে এসেছে বলে দিয়েছি—'
মলিনা শঙ্কিত হয়।
মলিনা মলিন হয়ে যায়।
মলিনা আস্তে বলে, 'খুব জেরা করল?'
'খুব মানে কি? এমনি, মানে মেয়েলি কৌতূহল আর কি! বড়ো বোন না ছোটো বোন, বিধবা না সধবা, কোলে ছেলেমেয়ে আছে কি নেই, শ্বশুরবাড়ির সবাই সরে গেছে কেন? মা বাপই বা হাওয়া হল কবে? আমি কেন বিয়ে করিনি?—এইসব বহুবিধ মূল্যবান প্রশ্ন।'
মলিনা মাথা নীচু করে বলে, 'আমার ভয় করছে।'
'ভয়ের কি আছে?'
'যদি সন্দেহ করে?'
'সন্দেহ অমনি করলেই হল? তবে হ্যাঁ, ওই 'দাদা' আর 'আপনি'র সমস্যাটা! তালগোল না পাকিয়ে যায়।'
'আমার যাবে না তোমার যেতে পারে। এখন থেকে শুরু কর।'
বাসায় যখন ঢুকল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারিদিকে কেমন গ্রাম গ্রাম ভাব, বুনো বুনো গন্ধ বেরোচ্ছে। আর পলস্তারা ছাড়া বাড়িটা ঝোপের আড়ালে যেন ছায়ামূর্তির মতো গুঁড়ি মেরে বসে আছে।
মাধব ঘোষের বাসায় আর যাই হোক, প্রাণ ছিল। এ যেন মরে পড়ে আছে।
এ কোথায় এনে তুলল সুধানাথ মলিনাকে?
ইচ্ছে হল বলে, 'মনে হচ্ছে কবরে প্রবেশ করছি।'
বলল না।
সাড়া পেয়ে বাড়িওলা গিন্নি নামলেন। বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিলেন মলিনাকে। আর দেখে যেন একটু সন্তুষ্টই হলেন। পালিয়ে আসা খারাপ মেয়ের মতো দেখাচ্ছে না। নেহাৎ যেন দুঃখী দুঃখী, বিষণ্ণ বিষণ্ণ। যা বলেছে তাই হবে।
স্নেহপরবশ হয়ে বললেন, 'রাতে কি আর রাঁধতে পারবে? আমি বরং দুটো দানা ফুটিয়ে দিই—'
সুধানাথ বলল, 'পাগল হয়েছেন! আপনি বুড়ো মানুষ, আপনি খাটতে যাবেন কেন? আমি তো বাইরেই খাই, বোনের একটু মিষ্টি-টিষ্টি খেলেই হয়ে যাবে। এই ইয়ে—'

হঠাৎ থেমে গেল সুধানাথ।

অজিত ভট্‌চাযের স্ত্রীর নাম তো জানে না সে।

গিন্নি অতটা লক্ষ করলেন না।

বললেন, 'তা মেয়ে আমার কাছে খেতে পারত। আমরাও ছোটো জাত নই, তোমাদের মতনই মিত্তির-কায়স্থ।'

দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে উনি চলে যেতেই মলিনা দু'হাতে মুখ ঢেকে ভেঙে পড়ল। 'মাধব ঘোষের বাসায় তো তবু সব সত্যি ছিল, এ যে আগাগোড়া ছলনা হয়ে গেল। এ কি চালিয়ে যাওয়া সোজা? আমি মলিনা ভট্‌চায—'

সুধানাথ মাথা চুলকে বলে, 'মানে ব্যাপারটা হল কি—আমি তো মিত্তির।'

'বুঝেছি! কিন্তু বরদাস্ত করতে পারছি না, প্রতিপদে মিথ্যে পরিচয়, ধরা পড়ে যাবার ভয়—'

সুধানাথ সহসা ঘোষণা করে, 'ঠিক আছে, দু'চারটে দিন যা হোক করে চালান, অন্য বাড়ি দেখে চলে যাব। সেখানে সব সত্যি কথা বলে ঢুকব।'

মলিনা মুখ তুলল।

মলিনা একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলল, 'তাহলে ঢুকতেই দেবে না।'

সুধানাথ চলে গেল।

পথে বেরিয়েই যেন অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেল। আর মলিনার মনে হল—ভয়ঙ্কর এক নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করল ও।

এইখানে মলিনাকে একা ফেলে রেখে চলে গেল। একবার ওর অসহায়তার কথা চিন্তাও করল না!

অজিত যেদিন হঠাৎ আর এল না, সেদিনও বুঝি এমন অসহায়তা অনুভব করেনি মলিনা। বারো সংসারের উত্তাপ যেন মলিনাকে ঘিরে রেখেছিল। একঘরে হয়ে পড়ে থেকেও এমন ভয় করেনি।

কিন্তু আর কি-ই বা করার ছিল সুধানাথের? চলে যাওয়া ছাড়া?

এই একটা ঘরের বাসায় সে কোথায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে মলিনার ভরসা জোগাত?

দরজায় খিল লাগিয়েছে।

জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখল মলিনা। বোধ করি অমাবস্যার কাছাকাছি কোনো তিথি। তাই আকাশ, মাটি সব অমন নীরন্ধ্র অন্ধকার। ঠিক যেন মলিনার ভবিষ্যৎ।

পৃথিবীর এই অন্ধকারের মুক্তি হবে। আকাশে নতুন সূর্য উঠবে। কিন্তু মলিনার?

তারপর ভাবতে লাগল, মাধব ঘোষের বাসাটা চট করে ছেড়ে আসা কি ঠিক হল?—যদি—সুখদার চোখ নির্ভুল না হয়, যদি অজিত কোনোদিন ফিরে আসে?

যদি আজকালই আসে?

দু'মাস আসেনি বলে যে, দু'মাস পাঁচদিনের দিন আসতে পারে না, তা তো নয়!

এসে দাঁড়িয়ে যদি ওই বারো ঘরের সামনে প্রশ্ন করে, 'মলিনা কোথায়?'

ওরা কে কি উত্তর দেবে যেন স্পষ্ট দেখতে পায় মলিনা। দেখতে পায় দাস গিন্নির, মণ্ডল গিন্নির, নগেন গিন্নির আর সুখদার ঘৃণায় বিকৃত মুখ...

তারপর অজিতের মুখ দেখতে পায়।

কিন্তু এ কি!

অজিতের মুখের একটা কুঞ্চিত পেশীর ভঙ্গি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না কেন মলিনা? আর সব কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

অজিতের মুখটা কি মলিনা এই দু'মাসেই ভুলে গেল?

এ কি হচ্ছে ভগবান!

সেই ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া বিচ্ছিন্ন মুখ শবদেহটাই অজিত হল না কেন? অজিত কেন ঝাপসা হয়ে গিয়ে মলিনাকে আঙুল তুলে শাসাবে? কেন তীব্র ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলবে, 'কি গো, তিনটে মাসও পারলে না এই হতভাগার অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে?'

সুধানাথের ওপর তীব্র একটা রাগ পাক দিতে লাগল মনের মধ্যে। ও যদি ওপরপড়া হয়ে এত না করতে আসতো, নিশ্চয়ই আর পাঁচজনে দেখত।...হয়তো—বারো ঘরে চাঁদা করে মলিনার মাসকাবারি বাজার তুলে দিত। হয়তো পালা করে এক একজন এক একদিন নিজেদের বাজার থেকে আলুটা বেগুনটা দিত, হয়তো মলিনার সেই দুর্দশা দেখলে মাধব ঘোষ, সত্যিই ভাড়া চাইত না। আর হয়তো ক্রমশ মলিনা রাঁধুনীগিরিতে পাকা হয়ে উঠত।

সমস্ত সম্ভাবনাকে ঘুচিয়ে দিয়েছে ওই সুধানাথ!

ঈশ্বর জানেন ওর কি মতলব! এখন তো ভাইবোন, দাদাদিদি, অনেক ভালো ভালো সম্পর্ক পাতাচ্ছে, পরে কি মূর্তি ধরবে কে জানে! শুনেছি সিনেমায় কাজ করে। আমাকে কারুর কাছে বেচে দেবে না তো? গোড়া থেকেই তাই আমাকে গ্রাস করছে?

মলিনা নিজেই যে গোড়ার দিন এতগুলো চেনা লোককে বাদ দিয়ে ওই সামান্য চেনা ছেলেটাকেই 'আশ্রয়' বলে গণ্য করেছিল, 'ঠাকুরপো' ডেকে অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করেছিল, আর অতগুলো লোকের একজনও অজিতের জন্যে একটা আঙুল নাড়েনি, সুধানাথই সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, এসব ভুলে যায় মলিনা।

মলিনা শুধু সুধানাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমিয়ে তুলতে থাকে।...

বলতে থাকে, ওই আমার শনি!

ওই আমার রাহু!

আমার পাঁজরের হাড় খুলে খুলে ছড়িয়ে দিল ও! সেই আমার সাজানো ঘর, সে চলে গিয়েও যেখানে যা অবিকল ছিল, সেই ঘর তছ্‌নছ্‌ করে যেন দস্যুর মতো লুটে নিয়ে এল আমাকে!

নিশ্চয় ধুলো পড়া দিয়েছে ও আমাকে। জানে বোধহয় কিছু। নইলে আমার এমন বুদ্ধি হয়ে গেল কেন!

প্রতিনিয়ত যে সেই সহানুভূতিহীন, নিষ্ঠুর ঠাঁই থেকে পালাবার জন্যে ছটফট করছিল মলিনা, সেকথা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ওখানের সকলের জন্যে মন কেমন করছে তার। এমনকি আধা-হাবা, তোৎলা মদনাটার জন্যে পর্যন্ত।

এবারে পুজোয় স্বপনকে সে একটা জামা দেবে ভেবেছিল। পুজোয় বোনাস পায় অজিত। ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারতো মলিনা। স্বপনের মা তাকে ভালোবাসে, স্বপনকে মলিনা ভালোবাসে।

ওদের কাছ থেকে মলিনাকে ছিনিয়ে নিয়ে এল সুধানাথ।

নিয়ে না এলেও যে ওসব কিছু হতো না, সেকথা ভাবছে না মলিনা।

অনেক ভেবে, অনেক কেঁদে, শেষ অবধি সংকল্প করল মলিনা, কাল সুধানাথ এলেই বলবে, আমায় সেই পুরনো বাসাতেই রেখে এসো। নিজেই একটা রাঁধুনীগিরি জুটিয়ে নিয়ে চালাব আমি। একটা পেট, এত কি ভাবনা! পরের দয়াই বা নেব কেন বারোমাস? তুমি আমার কে?'

এই সিদ্ধান্তটা করে যেন অনেকটা শান্তি বোধ করল মলিনা। শেষ রাত্রের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙল, হঠাৎ যেন সব ওলট-পালট হয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল।

মরি মরি, এত সুন্দর জায়গা!

আর রাত্রে অত বিভীষিকা দেখছিল মলিনা।

গাছপালা বাগান পুকুরে ঘেরা বাড়িখানা যেন মলিনার দূর শৈশবের পিতৃভূমিকে মনে করিয়ে দিল।

ওই পুকুরটা যে রাত্রে জানলা দিয়ে একটা অন্ধকারের গহ্বর মনে হচ্ছিল, আর ওর ধারের নারকেল গাছগুলোকে এক পায়ে খাড়া দৈত্যের মতো লাগছিল, সে কথা ভেবে হাসি পেল মলিনার।

বাড়িটা ছোট্ট, জমিটা অনেকখানি। সবুজ ঝোপঝাড়ের মাঝে মাঝে গাছ আলো করে ফুটে থাকা জবা, করবী যেন মলিনার জ্বরতপ্ত মনে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিল।

ভাবল, বড়ো সুন্দর জায়গাটি আবিষ্কার করেছে সুধানাথ। এমন নিঃসঙ্গ নির্জনতাই তো এখন মলিনার কাম্য। অনেকের দৃষ্টির কলুষ সহ্য করবার ক্ষমতা কি তার আর আছে?

থাকার মধ্যে দু'টো বুড়ো বুড়ি।

তাও দোতলায় থাকে।

এক আধবার আসবে। একটু ভেবেচিন্তে কথা বলতে হবে। ভুললে চলবে না, সে সুধানাথ মিত্তিরের বোন।

সুধানাথ এলে আর বলা হল না মলিনার, 'আমাকে পুরনো বাসায় রেখে এস।'

বাগানে বুড়ি শাক তুলছিল, তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ও দাদা, দাদাগো, কী চমৎকার জায়গা খুঁজে বার করেছ। মনে হচ্ছে সেই আমাদের ছোটোবেলার গাঁয়ে এসে পড়েছি।...আহা এমন বাড়িতে তুমি থাকতে পাবে না দাদা!...আর একটা যদি ঘর থাকত!'

সুধানাথ কাছে এসে হেসে বলে, 'এত এরকম 'দাদা দাদা' করলে তো—'তুই' না ডাকলে মানায় না।'

'তা ডাকো! যেটা মানানসই সেটাই কর।'

'এদিকে তো দাদা ছোটো বোনের নাম জানে না।'

'ওমা তাই নাকি? গিন্নিরা তো ডাকতেন শোননি?'

'আমি আর কবে বাড়ি থেকেছি?'

'তা বটে। তা জেনে রাখো, আমার নাম 'মলিনা।'

'মলিনা!'

সুধানাথ নাক কুঁচকে বলে, 'এঃ, মানানসই কোথায়? একেবারে বেমানান! এ নাম অচল।'

'এতদিন চলে এল, আর এখন অচল?'

'হুঁ! পদবী যখন পালটেছে, নামও পালটাক। মলিনা নয়, মণিলা।'

'মণিলা আবার নাম হয়?'

'হওয়ালেই হয়।'

'লাভ কি?'

'মলিনা শুনতে বিচ্ছিরি।'

হঠাৎ কথাটা ভারী অদ্ভুত লাগে মলিনার। তার এই উনত্রিশ বছরর জীবনে একথা তো কেউ কোনোদিন বলেনি! অজিত তো 'মলিনা মলিনা'ই করেছে, কোনোদিন বলেনি 'শুনতে বিচ্ছিরি'।

মলিনাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুধানাথ একটু ভয় পায়। বলে, 'রাগ করলেন?'

মলিনা হেসে ফেলে বলে, '' 'করলেন?' আবার 'আপনি!' তুমিই ফাঁসাবে দেখছি।''

সুধানাথ জিভ কাটে।

তারপর বলে, 'তা হলে রাগ নয়?'

'না রাগ কিসের! তবে নামটা ছোটো করেও নিতে পার। 'লীনা' বলতে হয়'

'লীনা! লীনা! তা মন্দ নয়।'

বাড়িওলা-গিন্নি চারটি শাক এনে ধরেন, 'মেয়ে শাক খাওতো?'

'ওমা খাব না কেন? শাক ভাতই তো সম্বল মাসিমা।'

'আহা ষাট! এয়োস্ত্রী-মানুষ! তা নামটি কি গো?'

'লীনা।'

'লীনা? তা ওসব শক্ত নাম আমার মুখে আসবে না, লীলাই বলব! ভাই খাবে তো তোমার কাছে?'

'কোথা?' মলিনা বলে, 'ওতো এক্ষুনি চলে যাবে। দেখুন না, এমন কাজ, খাবার সময় নেই। শুধু নিজের জন্যে রাঁধতে ভালো লাগে?'

'তা তো সত্যি।' বলে চলে যান গিন্নি শাকগুলি নামিয়ে রেখে।

মলিনা মৃদু হেসে বলে, 'আর একবার নাম পালটালো।'

'জীবনটাই তো ওলট-পালট।'

'গিন্নি আমায় একটু কম ভালোবাসলে হয়। কিন্তু মনে হচ্ছে বড্ড বেশি ভালোবাসেন।'

'সেটা বোধহয় আপ্—থুড়ি, তোমার স্বভাবের গুণ।'

স্বভাবের গুণ!

মলিনার স্বভাবে কোনো গুণ আছে, একথাই বা কে কবে বলেছে? সবাই তো মলিনার মেজাজের নিন্দেই করে। অজিত তো ফি হাত বলতো, 'রণচণ্ডী!' বলতো 'বাবাঃ আগুনের খনি!'

মলিনার সে স্বভাবের যে পরিবর্তন হয়েছে, ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় মলিনা গুঁড়ো হয়ে গেছে, এ মলিনা নিজে টের পায় না।

আর এও জানতে পারে না ওই সুধানাথই মলিনাকে 'উঁচু নাকী' বলে অভিহিত করত।

রোজ সকালে একবার করে আসে সুধানাথ। কি আছে নেই দেখতে।

অভিনয় চলে। 'লীনা, তুই' বলে হেঁকে হেঁকে কথা বলে। বলে, 'কী রাঁধছিস, কি? শুধু আলুসেদ্ধ ভাত? কেন, মরতে হবে না কি? তবে তিলে তিলে আর কষ্ট করা কেন? গলায় এক গাছ দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়!'

গলা তুলে বলে, আর গলা নামিয়ে হাসে।

সেই নামানো গলায় বলে, 'এর চেয়ে সিনেমা থিয়েটারে নেমে পড়লে আখের গুছিয়ে নেওয়া যেত। তার চাইতে তো কম করছি না।'

করছে না!

সত্যিই কিছু কম করছে না। দুজনেই!

সুধানাথ চলে যাবার মুখে মলিনা হেঁকে হেঁকে বলে, 'ও দাদা, তা এক বাটি খেয়ে যাও অন্তত। রোজ অমনি মুখে চলে যাও।'

সুধানাথ আরও হেঁকে, যাতে দোতলার ঘর ভেদ করে কণ্ঠস্বরটা পৌঁছয় সেইভাবে বলে, 'আজ আর নয়, কাল। কাল চায়ের সঙ্গে চিঁড়ে ভেজে রাখিস!'

এমন যে পারবে তারা, এ একেবারে ধারণাই ছিল না। এ যেন এক মজার খেলা! সত্যিই যেন অভিনয়ে নেমে পার্ট প্লে করছে দু'জনে। যত করে তত পুলকিত হয়, তত কথার জোগান আসে, তত হাসিতে ঔজ্জ্বল্য আর ভঙ্গিতে সাবলীলতা আসে।

তবু পণ্ড হল।

তবু শেষ রক্ষা হল না!

প্রথমে মাঝে মাঝে তাল ভঙ্গ।

গিন্নি বলেন, 'হ্যাঁ গা লীলা, তুমি যে বলেছিলে এখানে আসার আগে শিবপুর থাকতে, আর তোমর ভাই ওনার কাছে বলল, 'গড়ে'য় না কোথায় থাকত?'

মলিনা যদিও চটপট বলে, 'গড়ে'য় আর ক'দিন থেকেছি মাসিমা! কুল্লে একটা মাস। ভাড়া বেশি বলে ছাড়তে হল—।' তবু মলিনার হঠাৎ শুকনো হয়ে আসা মুখটা ক্ষীণদৃষ্টি বুড়িরও নজর এড়ায় না।

আবার একদিন ধরেন, 'হ্যাঁ গা লীলা, তোমাদের ভাই বোনের কথার মিল নেই কেন বল তো? তুমি বললে তোমাদের দেশ নবদ্বীপের কাছে পাটুলী, আর ও বলল, মুর্শিদাবাদ। এমন উল্টোপাল্টা কথা আমরা পছন্দ করি না।'

মলিনা কষ্টে হেসে বলে, 'বিয়ে হওয়া মেয়ের দেশটা যে আর বাপ ভাইয়ের দেশ থাকে না, সে কথাও কি ভুলে গেলেন মাসিমা?'

তবু বুড়ি অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, 'তুমি তো পাটুলীতে তোমার ছেলেবেলার খেলার গল্প করলে—।'

মলিনা তবু বাঁধ দেবার চেষ্টা করে।

মলিনা তবু হাসে, 'তা মাসিমা ছেলেবেলা ছাড়া আর কি! বারো বছরে পড়তেই বিয়ে, খেলারই তো বয়েস!'

কিন্তু এই ঝুরো বালির বাঁধে কত দিন আটকানো যায়?

ধরা পড়ল। অনেক জেরার মুখে জোগাবার মতো বালি আর কুলোল না। বরং ভাঙন ধরলো আর এক ঘটনায়।

মাধব ঘোষের বাসার নগেনবাবু ক'দিন খুঁজে খুঁজে এ বাসায় এসে লীনার অজান্তে বাড়িওলার সঙ্গে আলাপ করে গেলেন।

তারপর গিন্নি ধরলেন সাট্টে পাট্টে।

প্রথমে ভালোমানুষী করে জিগ্যেসবাদ, ক্রমশ জেরা, অতঃপর উগ্রমূর্তি।

বললেন, 'দু'দিন হলে, তিন দিন করবে না, আমার বাড়ি ছেড়ে দেবে। এত বড়ো পাহাড় মেয়েমানুষ তুমি, সোয়ামি রেলে কাটা পড়ল, সে কথা উড়িয়ে দিয়ে দু'দিন না যেতেই একটা পরপুরুষের সঙ্গে ভেগে এলে, আবার ভাই-বোন পরিচয়! ভাই-বোন সম্পর্কয় কলঙ্ক ধরানো! ছিঃ ছিঃ! তুমি বামুনের মেয়ে না? তোমার বরের নাম অজিত ভঠ্চায্যি ছিল না? ও ছোঁড়া কায়েৎ না?'

এরপর আর কি দিয়ে বাঁধ দেবে মলিনা।

সুধানাথ এলে বাড়ির কর্তা হাল ধরলেন। বললেন, 'এই দণ্ডে পার, এই দণ্ডে! আমার এই ধর্মের বাড়িতে এত অনাচার!' এমন ইসারাও দিলেন, সুধানাথ লোক দেখিয়ে সকালে এসে চলে যায়, তারপর কে জানে রাতের অন্ধকারে আসা-যাওয়া করে কিনা।

মাথা হেঁট করে বেরিয়ে আসতে হল সেই বাগান পুকুর ঘেরা স্নিগ্ধ ছায়ার আশ্রয় থেকে।

'আমাকে তুমি ছাড়', বলল মলিনা। 'আবার আমায় ঘাড়ে করে করে বেড়াবে, আর কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলবে। এ কেন? কি দায় তোমার?'

'কি দায় আমার, বাঃ!' সুধানাথ তাচ্ছিল্যভরে বলে, 'এ কথার কোনো মানে হয়? হঠাৎ তোমাকে ছাড়ব কিভাবে? গড়ের মাঠে ছেড়ে দিয়ে আসব?'

'সে যাই হোক', মলিনা উত্তেজিত হয়, 'আমার জন্যে তুমি 'মিনারের' চাকরি ছাড়বে, বেলেঘাটায় বাস করতে যাবে, এর কোনো মানে হয় না। কেন তুমি এত করবে আমার জন্যে?'

হঠাৎ সুধানাথের মুখের চেহারা কেমন একরকম হয়ে যায়। সুধানাথের চোখের দৃষ্টিতে কিসের যেন ছায়া পড়ে। সুধানাথ আস্তে বলে, 'সব কথা কি খুলে বলা যায়?'

মলিনা মাথা নীচু করে।

মলিনার সিঁথির কালচে হয়ে যাওয়া অতীতের সিঁদুরের অস্পষ্ট রেখাটায় যেন সিঁথিটাকে ক্লেদাক্ত মনে হয়। মলিনা তারপর মুখ তুলে বলে, 'কিন্তু আমি এত দয়া নেব কেন?'

'না হয় মনে করো, আমায় দয়া করছ।'

সত্যিই 'মিনারের' চাকরি ছাড়ল সুধানাথ।

শেয়ালদা অঞ্চলে একটা কাটা কাপড়ের দোকানে কাজ জোগাড় করে ফেলল, আর বেলেঘাটায় একটা বাসা ভাড়া করল।

এ বাসায় বাড়িওলা নিজে নেই।

আর একঘর ভাড়াটে আছে—মাত্র স্বামী-স্ত্রী। তাও নেহাত যেন বোকাসোকা মতো। সুধানাথ বলল, 'এই বেশ। চালাক পড়শী আগুনের সমতুল্য।'

কিন্তু এ খেয়াল ছিল না সুধানাথের, বোকার লেজের আগুনেই লঙ্কাকাণ্ড বাধে।

প্রথম দর্শনেই সেই বউ বলে বসল, 'এই বেশ হল ভাই, আমরাও বরটি বউটি, তোমরাও বরটি বউটি। আমারও ছেলেপুলের বালাই নেই, তোমারও—'

মলিনা তাড়াতাড়ি বলল, 'কি বাজে বাজে কথা বলছ? ও আমার দাদা।'

'দাদা!'

বউটা যেন এক ফুঁয়ে নিভে গেল। শুকনো মুখে বলল, 'দাদা আর বোন? এই সংসার?'

'দাদা তো থাকবে না, অন্য জায়গায় খাবে শোবে। আমার জন্যেই—'

'শুধু তোমার জন্যে? তা তোমার স্বামী?'

'স্বামী দেশে থাকেন। পাগল!'

'ওমা! সেই পাগল স্বামীর সেবা যত্ন ছেড়ে তুমি ভাইয়ের ভাতে কলকেতায় বাসা ভাড়া করে থাকতে এসেছ?'

মলিনা অনেক সয়েছে।

মলিনা অনেক বদলেছে।

তবু মলিনা মানুষ তো! মেয়ে মানুষ! আর কত সইবে? তাই বিরক্ত স্বরে বলে, 'আমি কি করতে এসেছি না এসেছি, সে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কি? আমি তো তোমার সংসারে ঢুকতে আসিনি!'

বউটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'বলছ তো ঢুকতে আসিনি। আসতে কতক্ষণ? এই তুমি একা সুন্দরী যুবতী, মাথার ওপর না শাশুড়ি ননদ, না স্বামী, দাদা পর্যন্ত থাকবে না বলছ। যার নাম একেবারে বেওয়ারিশ! আমার বরকে আমি সামলাব কি করে? সুন্দরী মেয়েমানুষ দেখলে ওর আর জ্ঞানগম্যি থাকে না!'

মলিনা হাসবে না কাঁদবে? ডাকছেড়ে কাঁদতেই তো ইচ্ছে করছে, তবু মলিনা হেসেই বলে, 'তোমার স্বামীর সামনে আমি না বেরোলেই তো হল?'

সে বেচারি এ আশ্বাসে কোনো ভরসা পায় না। চোখের জল ঠেকাতে ঠেকাতে বলে 'এক বাড়ি, এক ঘর, ওকি আর একটা কাজের কথা? তুমি না বেরালেও, ও তো ঘুরঘুরিয়ে বেড়াবে। সঙ্গে তোমরা একটা দুঁদে বর থাকত, আমি নিশ্চিন্দি থাকতাম। এ যদি রাতবিরেতে উঠে গিয়ে—'

শেষ পর্যন্ত আর শোনার ধৈর্য হয় না মলিনার, নিজেই উঠে যায়।

কিন্তু চিন্তায় পড়ে।

এ বাড়িতে কি থাকা সম্ভব হবে?

সুধানাথকে বলতে লজ্জা করে, অথচ অস্বস্তিরও শেষ থাকে না।

সত্যিই, বেচারি বউটির জ্ঞানগম্যি-হীন বর ছুতোয়নাতায় মলিনার ধারে কাছে ঘুরঘুর করে, মলিনার জানলায় উঁকি মারে, স্নানের ঘরের ঘুলগুলিতে চোখ ফেলে বসে থাকে।

সাপের কামড় এক কোপ্!

কাঠপিঁপড়ের কামড় অসহ্য!

সুধানাথকে না বলে পারা যায় না। আর শোনামাত্র শান্ত সুধানাথের ভিতর থেকে এক দুর্দান্ত গোঁয়ার মূর্তি বেরিয়ে আসে।

যে মূর্তি ছুটে গিয়ে অপরাধীর ঘাড় চেপে ধরে।

বলা বাহুল্য, পরবর্তী ঘটনা এক কুৎসিত কেলেঙ্কারির রূপ নেয়। পতির বিপদাশঙ্কায় পতিব্রতা সতী পরিত্রাহী চিৎকারে পাড়ার লোক জড় করে, এবং 'সত্য' নামক দেবতার মাথায় লাঠি বসিয়ে সক্রন্দনে বলতে থাকে, 'ওগো এতদিন সয়ে সয়ে আছি, তোমাদের বলিনি। ওই একটা নষ্ট মেয়েমানুষ পাগল স্বামীকে দেশে ফেলে রেখে পাতানো দাদার সঙ্গে চলে এসে বসে আছে, আর আমার ভালোমানুষ স্বামীকে নষ্ট করবার তালে নিত্যদিন হাসছে, ইসারা করছে, ডাকাডাকি করছে। তা চোরের সাতদিন, সাধুর একদিন! আজ ওর ওই ভাই না ভালোবাসার লোক কে, তাঁর সামনে ধরা পড়ে গেছে। এখন ও এসেছে আমার স্বামীকে খুন করতে—'

স্বামীকে বাঁচাতে এমন বহুবিধ কথা বলে চলে সে। এবং দেখা যায় পাড়ার লোক তার প্রতিই সহানুভূতিশীল।

না হবেই বা কেন? একটা নষ্ট দুষ্ট মেয়ের প্রতি কার সহানুভূতি থাকে?

আর একা একটা বাসা ভাড়া করে থাকে কোনো শিষ্ট সভ্য মেয়ে?

অতএব ধরে নিতে হচ্ছে এ বাসাও গেল।

সুধানাথ হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আচ্ছা এরকম কেন হচ্ছে বল তো?'

মলিনা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'অলক্ষ্মী কিনলে এই রকমই দশা হয়। দেখছ না আমি বিষকন্যে! তোমায় দোহাই দিচ্ছি, তুমি আমায় ছাড়।'

সুধানাথ একমিনিট চুপ করে চেয়ে থেকে বলে, 'বেশ, ধর ছাড়লাম। এই চলে গেলাম আর এলাম না। তারপর?'

'যা করবেন ভগবান। যা আছে কপালে।'

'কথাটা বলতে সোজা, ব্যাপারটা সোজা নয়। এমনও তো মনে করতে পার, ভগবান আমার মধ্যে দিয়েই তোমাকে দেখছেন। সব মানুষের মধ্যেই তিনি আছেন, একথা মান তো?'

'মানতে পাচ্ছি কই? মনে হচ্ছে 'ভগবান' বলে কোথাও কেউ নেই।'

সুধানাথ আস্তে বলে, 'এখুনি অতটা বিশ্বাস হারাবে কেন? মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, সুবিধে-অসুবিধে তো আছেই—আসবেই।'

'আমার জীবনটা কি অন্য কোনো মানুষের মতো?'

'বল কি? তুমি ক'টা জীবন দেখেছ? আরও কত বিপর্যয় আসে জীবনে!'

'দাদা' বলতে বাধ্য হওয়া থেকেই তুমিটা রপ্ত করতে হয়েছে সুধানাথকে। অতএব কেমন করেই যেন মলিনার পোস্টটা ছোটোর মতোই হয়ে গেছে। সুধানাথ ওকে বুঝ দেয়, সান্ত্বনা দেয়, কখনও কখনও ধমকও দেয়।

সেদিন দিল ধমক।

যেদিন সুধানাথ আবার এসে একটা নতুন বাসার খোঁজ দেওয়ায় মলিনা বলে উঠল, 'যতই তুমি বল ভগবান মানুষের মধ্যে দিয়েই দেখেন, তবু আমি তোমায় হাত জোড় করছি, আমার চিন্তা ছাড়ো।'

সেদিন ধমকে উঠল সুধানাথ।

বলল, 'এই এক বাতিক হয়েছে দেখছি তোমার। তোমাকেই হাত জোড় করছি, ওই কথাটা বলা তুমি ছাড়ো। আশ্চর্য! চিন্তা করব না? কোনো মানে হয় কথাটার?'

সুধানাথের মনে হয়েছিল মলিনার কথার মানে হয় না। তাই সুধানাথের হিসেবে যে কাজের মানে আছে, তাই করেছিল সুধানাথ উঠেপড়ে লেগে। কাজকর্ম কামাই দিয়ে বাড়ি খুঁজেছিল।

আর সাধনায় সিদ্ধি ঘটেছিল তার।

অথবা অসাধ্য সাধনের একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল সে।

তা কলকাতা শহরে নিত্য এক একটা বাসা খুঁজে ঠিক করে ফেলা অসাধ্য সাধন ছাড়া আর কি।

মলিনা বলে, 'আবার হয়তো সেখান থেকে দূরদূর করে খেদিয়ে দেবে।'

সুধানাথ বলে, 'পরের কথা পরে আছে, এখন যে আজই এদের মুখের সামনে দিয়ে গট গট করে বেরিয়ে যেতে পারব, তাই ভেবেই স্ফূর্তি লাগছে আমার।'

'তা এই স্ফূর্তিটির জন্যে কতটি দাম দিতে হল?'

কথাটা সুধানাথ বুঝতে পারলো না, অথবা না বোঝার ভান করল। তাই ভুরু কুঁচকে বলল, 'দাম মানে?'

'মানে? আমি একেবারে সোজা মানেটার কথাই জিগ্যেস করছি। ভাড়া কত দিতে হবে?'

'সে খোঁজে তোমার দরকার কি?'

'দরকার আছে।' মলিনা বিষণ্ণ গলায় বলে, 'এই অলক্ষ্মীর জন্যে কতটা দণ্ড দিতে হচ্ছে তোমায়, জেনে রাখতে চাইছি।'

'লাভ কি জেনে?'

হঠাৎ মলিনা আর এক দৃষ্টিতে তাকায়। খুব আস্তে বলে, 'জানতে পারলে নিজের দামটাও যাচাই হয়ে যেত!'

সুধানাথ এ দৃষ্টির সামনে মুহূর্তকাল চোখ নামায়, তারপরই খুব খোলা গলায় বলে ওঠে, 'শুধু ওইটুকু থেকেই আপনি সেই দামটা যাচাই করবেন? আচ্ছা মেয়ে তো? নিন সব গুছিয়ে টুছিয়ে নিন। আমি একটা 'ঠেলা' নিয়ে আসি।'

অনেকদিন পরে আবার আজ হঠাৎ 'আপনি' বলে।

সুধানাথ চলে যায়।

মলিনা তার সেই ক'দিনের 'ঘরের' দিকে তাকিয়ে দেখে।

গুছিয়ে নিতে হবে।

এই জঞ্জালগুলো আবার গুছিয়ে নিতে হবে তাকে?

এই বঁটি কাঁটারি, শিল নোড়া, ঝুড়ি কুলো, বাসন উনুন।

কেন?

কী দরকার এসবের?

খেতে হবে?

সে তো ওই একটা অ্যালুমিনিয়মের বাটিতেই হয়ে যাচ্ছে সারা। ভাতে ভাত ছাড়া তো আর কিছু রাঁধেনি কোনোদিন তারপর থেকে।

শুধু একটা খাবার থালা আর ওইটা নিলেই তো চুকে যায়, আর সব থাক না পড়ে। বাড়িওলা টান মেরে ফেলে দেবে।

আশ্চর্য! এই জঞ্জালগুলোই একদা প্রাণতুল্য ছিল মলিনার।

আর কত চেষ্টায়, কত আগ্রহেই না সংগ্রহ করেছে এসব! অজিত বলত, 'কি হবে এত সবে? যত আসবাব বাড়াবে, তত খাটুনী বাড়বে।'

মলিনা ঝঙ্কার দিত।

মলিনা বলত, 'তা বাড়ুক। তাই বলে বেদের টোলের মতোন সংসার হবে না কি? খাটুনী কমিয়ে আমি আর কোন মহৎ কর্ম করব শুনি?'

অজিত জানত, এ ধরনের কথাবার্তার পরই একটি অশ্রুবর্ষণের পালা এসে পড়তে পারে। কারণ মলিনার যে আর পাঁচটা মেয়ের মতো 'আসল' কর্মটাই নেই, সেই অভাবটা উথলে ওঠে মলিনার এসব প্রসঙ্গে।

অতএব অজিত তাড়াতাড়ি বলত, 'থাকবে না কেন? পতিদেবতার পিঠটা একটু চুলকে দাও দিকি ভালোবাসা মাখিয়ে মাখিয়ে। ওর বড়ো মহৎ কর্ম আর কিছু নেই।'

মলিনা বলত, 'আহা রে! কী একেবারে মহৎ কর্মের হিসেব নিয়ে এলেন! নারকেল কোরবার কুরুণী একখানা চাই আমার।'

একটা মানুষের অভাবে যে সমস্ত জিনিসগুলো এমন মূল্যহীন হয়ে যায় জানা ছিল না মলিনার।

আজ তাই অবাক হয়ে যাচ্ছে।

ভাবছে, আচ্ছা এত জঞ্জাল কেন জমিয়েছিলাম আমি?

এই তুচ্ছ জিনিসগুলোর জন্যে কত সময় কত উত্যক্ত করেছি মানুষটাকে!

কিন্তু—হঠাৎ যেন চমকে ওঠে মলিনা। যেন হঠাৎ একটা অনাবিষ্কৃত দেশ দেখতে পায়।

আচ্ছা, ওকে আমি তেমন করে ভাবি কই?

ও কেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে?

আমি স্বপনকে ভাবি, স্বপনের মাকে ভাবি, দাস গিন্নি, মণ্ডল গিন্নি, সবাইয়ের কথাই ভাবি, এমনকি মাঝে মাঝে সুখদার কথাও ভাবি, অতএব ওকেও ভাবি।

তার বেশি নয়।

তবে কি আমি সত্যিই খারাপ? আমার মতো মেয়েকেই অসতী বলে?

একটা জিনিসও গোছায় না মলিনা, চুপ করে বসে থাকে।

একটু পরে সুধানাথ এসে পড়ে ঠেলা নিয়ে।

অবাক হয়ে বলে, 'এ কি গোছাওনি কিছু?'

'না!'

'না কেন বল তো? এরা কিছু বলেছে নাকি?'

'না, ওরা আবার কি বলবে?'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আমিই গুছিয়ে নিচ্ছি।'

তারপর—

সুধানাথ যখন হাত লাগিয়েছে, তখন আর কিছু ভাববার নেই।

সব করবে, গাড়ি ডেকে আনবে, মলিনাকে ডেকে তুলে নিয়ে যাবে।

'পূর্বজন্মের কত শত্রু ছিলাম আমি তোমার!' বলে মলিনা।

সুধানাথ হাসে, 'পূর্বজন্মের কেন, এজন্মেরই।'

'তাও মিথ্যে নয়। শুধু শত্রু কেন, শনি, রাহু সব।'

গাড়িতে চলতে চলতে কথা হয় ভবিষ্যৎহীন ভবিষ্যতের।

মানিকতলার সরু এক গলির মধ্যে বাসাটা। কিন্তু মুশকিল এই, দু'খানা ঘরের আস্ত একটা বাড়ি। ভাড়া তো বেশি-ই কিন্তু সেজন্যও নয়, একা কি করে থাকবে মলিনা, সেইটাই বলে সুধানাথ।

মলিনা তীব্রস্বরে বলে, 'তবু তোমার লোক-সঙ্গের সাধ?'

সুধানাথ অপ্রতিভ হয়।

দু'কানে হাত দিয়ে বলে, 'সাধ কিছুমাত্র নেই। লোকের নামে দু'কান মলি। তবু তুমি একেবারে একা—'

মলিনা গম্ভীরভাবে বলে, 'একেবারে একা কেন? বলছ তো দু'খানা ঘর। তুমি তোমার শেয়ালদার দোকানের বাস উঠিয়ে চলে এস। একত্রে রাঁধাবাড়ায় খরচেরও সাশ্রয় হবে।'

সুধানাথ স্তব্ধ হয়ে যায়।

সুধানাথ পাথরের পুতুল বনে যায়। তারপর সুধানাথ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'ঠাট্টা করছ?'

'ঠাট্টা?' মলিনা শান্ত গলায় বলে, 'না ঠাট্টা করছি না, সত্যিই বলছি।'

'এটা কি সত্যি করে বলবার কথা?'

'কেন? অসম্ভবই বা কিসে? সাহস নেই?'

সুধানাথ উঠে দাঁড়ায়।

চঞ্চলভাবে পায়চারি করতে করতে বলে, 'এত তাড়াতাড়ি তোমার এই জিগ্যেসের উত্তর দিতে পারছি না।'

'বেশ, একা রাত ভাবতে সময় নাও।'

'আগুন নিয়ে খেলতে তোমার সাহস হয়?'

মলিনা অদ্ভুত একটা হাসি হেসে বলে, 'সর্ব্বস্ব যার পুড়েই গেছে, তার আবার আগুন নিয়ে খেলার ভয় কি?'

'লোকে মিথ্যে বদনাম দিচ্ছে, সে আলাদা কথা। কিন্তু—'

মলিনা তেমনি করেই হেসে উঠে বলে, 'কিন্তু আর কি? তখন না হয় লোকে সত্যি বদনাম দেবে।'

সুধানাথ উত্তেজিত গলায় বলে, 'তুমি কি আমায় পরীক্ষা করছ?'

'তোমায় নয়, আমায়। খোলা তরোয়ালের ওপর দিয়ে হেঁটেই দেখি না একবার। পরীক্ষা হয়ে যাক সতী, কি অসতী!'

সুধানাথ বসে পড়ে।

অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করে বসে থেকে বলে, 'বেশ! তোমার যা ইচ্ছে।'

'আর এই শোনো'—মলিনা হেসে উঠে বলে, 'বাড়িওলাকে বলতে যেও না—ভাই বোন।'

সুধানাথ অবোধের মতো ওর কথাটাই আবৃত্তি করে, 'বলতে যাব না ভাইবোন?'

'না! ওইখানেই যত গণ্ডগোল! যা সচরাচর হয় না, তাই হতে দেখলেই একশো দিকে একশো চোখ কটমটিয়ে ওঠে।'

'তবে কি বলব?'

মলিনা নিতান্ত সহজ সুরে, যেন কিছু নয়, এইভাবে বলে, 'কিছু বলবে না, লোকের যা ইচ্ছে ভাবুক। যা স্বাভাবিক, তা ভাবলে কেউ কটমটিয়ে তাকাবে না।'

সুধানাথ আর একবার ছিটকে দাঁড়িয়ে ওঠে। ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'কী করেছি আমি তোমার? কী অন্যায় ব্যবহার দেখেছ আমার কাছ থেকে, তাই এইভাবে জুতো মারছ আমায়?'

'এই দেখ—'

মলিনা আস্তে এগিয়ে আসে। ওর একটা হাত ধরে বলে, 'রেগে অস্থির হচ্ছ কেন? আমি কি তোমায় অপমান করছি? যারা আজ অকারণে রাতদিন অপমান করছে, তাদের মুখের মতো উত্তর দিতে চাইছি। দু'টো মানুষ যদি বাসা খুঁজে বেড়ায়, ও ছাড়া আর কোনো কিছু ভাবতে পারে না লোকে! ব্যতিক্রম দেখলেই ছুরি শানায়, ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসে, তাই ভাবছি, এই অবধি থিয়েটারই তো করা হচ্ছে, এখন আর একটা নতুন পার্ট প্লে করি। দেখা যাক, কেমন উৎরোই।'

তা প্রথম ধাক্কাটা উৎরোলো বৈকি।

বলতে গেলে ভালোভাবেই উৎরোলো।

বাড়িওয়ালা অবশ্য ভাড়াটাদের সঙ্গে এক বাড়িতে নয়, তবে কাছেই তাঁর বড়ো দোতলা বাড়ি। এই অঞ্চলে ছোটোখাটো ভাড়াটে বাড়ি তাঁর বেশ খানকতক আছে। অতএব ব্যবস্থাও আছে।

বেকার ভাইপো আছে একটা, সে ভাড়াটেদের দেখাশোনা করে। এদের আসার সাড়া পেয়েই বাড়ির চাবি নিয়ে চলে এল। আকর্ণ হাস্যে বলল, 'যেমন বলেছিলেন, সক্কালবেলাই ঘর-দোর ধুইয়ে রেখেছি। রান্নাঘরে আপনার গিয়ে পাতা-উনুনও আছে, তাক আলমারি, খুব সুবিধের ব্যবস্থা।'

ওকে ভাগাবার তালে সুধানাথ তাড়াতাড়ি বলে, 'হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাক, করিয়ে রেখে অনেক উপকার করেছেন। আচ্ছা তাহলে—'

এখন স্পষ্ট 'বিদায় হও' শুনেও নড়ে না ছোকরা। তেমনি হাস্যরঞ্জিত মুখে প্রশ্ন করে, 'শুধু এই দু'জন? বাচ্চা-কাচ্চা নেই বুঝি?'

'না।'

'তা ভালো! খুব ভালো! আমার জ্যাঠামশাই আপনাদের খুব নেক্ নজরে দেখবে। বাচ্চা-কাচ্চা দু'চক্ষে দেখতে পারে না কি না! বলে একজোড়া করে পাখি আসবে, তার সঙ্গে একপাল করে ছানা। তার ওপর থাকতে থাকতে আবার ডিম পাড়বে।'

মলিনা এসেই একটা জানলার ধাপের উপর বসে পড়েছিল। ঘরের মেঝেয় তখনও সকালের ঘর ধোওয়া জল গড়াচ্ছিল, তাই পা-টা গুটিয়ে জড়সড় হয়ে বসেছিল।

ছেলেটার সঙ্গে কথা কয়নি গোড়ায়। এখন কথা বলে ওঠে, 'ওঁর বুঝি নিজের ছেলেমেয়ে নেই?'

'নাঃ। তাতেই তো বাচ্চা অসহ্য। যে ভাড়াটে পাঁচটা কুচোকাচা নিয়ে আসে, তাদের ছুতো-নাতা করে উঠিয়ে ছাড়েন। আপনাদের সে ভয় নেই।'

ছোকরা যে ঘরভেদী বিভীষণ, তা বোঝা যাচ্ছে। যার খায় তার চাল কাটে। তবে নীরেট বোকা।

মলিনা একটু নিশ্চিন্ত হয়।

বলে 'তোমার জ্যাঠামশাইকে বোলো, বাসা আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই থাকবে। দু'জনেই আমরা পরিষ্কার মানুষ।'

'হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আচ্ছা আবার আসব। যা সুবিধে অসুবিধে হয় জানাবেন।'

'না না, অসুবিধের কি আছে?' সুধানাথ বলে ওঠে।

মলিনা হঠাৎ একটু হেসে ওঠে, 'তোমার আবার সুবিধে অসুবিধে! সংসারের কিসে কি হয় জানো তুমি? ও ভাই, তোমাদের গোয়ালা আসে তো? আমার তো একটু দুধ চাই। অবিশ্যি বেশি নয়, পোয়াটাক, চায়ের জন্যে।'

'পাঠিয়ে দেব, গয়লা পাঠিয়ে দেব—'

ছেলেটা বলে, 'বাসন মাজা ঝিও তো চাই আপনার?'

'বাসন মাজা ঝি?' মলিনা হেসে ওঠে, 'না ভাই, ওসব বাবুয়ানীতে দরকার নেই। আমিই ওনার রাঁধুনী, বাসনমাজুনী, ঘরগুছানি সব।'

এবার সুধানাথ বলে ওঠে, 'তা বাসনটা মাজবার জন্যে একটা—এই শুনুন, আমাদের তো এই দেখছেন সামান্য বাসন, তিন-চার টাকায় পাওয়া যায় না কাউকে?'

'তিন-চার টাকা!' ছেলেটা মাথা নাড়ে, 'পাঁচ টাকার কমে রাজী হবে বলে মনে হয় না। আমাদেরই লোক, বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বেড়ায়। তাই করে মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করে।'

আরও খানিক বকবক করে চলে যায় ছেলেটা।

সুধানাথ বলে, 'যে প্যাটার্নের ছেলে দেখছি, যখন তখন এসে হানা দেবে মনে হয়।'

মলিনা অদ্ভুত একটু হেসে বলে, 'তাতে আর ভয়টা কি? পার্টটা কেমন প্লে করা গেল? নিখুঁত হয়নি?'

তা অভিনয় ক্ষমতা বোধ করি মানুষের সহজাত। তাই সহজ সুস্থ একটা মানুষ পাগলের পার্ট প্লে করেও কাটিয়ে দেয় ছ'মাস আট মাস। হাতে পয়সার বালাই নেই, তবু খাওয়াও জুটে যাচ্ছে, চেয়ে চিন্তে জুটে যাচ্ছে।

উলঙ্গ পাগল নয় যে, ধরে পুলিশে দেবে,—উন্মাদ পাগল নয় যে, ধরে কেউ ঠেঙাবে। এ হচ্ছে মজার পাগল!

কথার পাগল!

তাই আদর আছে লোকের কাছে।

সুস্থ লোকের কাছে পাগল বড়ো আকর্ষণীয় জীব। পাগলের মগজটা যেন একটা অজানা রত্নখনি, সেখান থেকে আহরণ করে তুলে নেওয়া যায় মণিমাণিক্য।

তাই পাগলের সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা কয় লোকে, কুরে কুরে প্রশ্ন করে, খাওয়ার লোভ দেখিয়ে দীর্ঘ সময় বসিয়ে রেখে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে, তার তারপর ক্ষেপিয়ে মজা দেখে।

এ সবই নাকি সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ!

এইসব সুস্থদের কাছে পাগলের আদর আছে।

তা লোকটা এদের বিপরীতে ভালোই অভিনয় করে চলেছে। মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ অনেক জায়গায় ছিটকে ছিটকে বেড়িয়ে, আশ্রয় নিয়ছে কাশীতে।

আর কাশীটা রীতিমতো ভালোই লেগে গেছে। তাই থেকে গেছে। ভাবে, এই বা এমন কি মন্দ পেশা? লোকে নাচ দেখায়, থিয়েটার দেখায়, ম্যাজিক দেখায়, ভাঁড়ামি দেখায়, আমি না হয় পাগলামি দেখাই। ওসবেও পয়সা দেয় লোকে, এতেও দিচ্ছে। দোষ কি?

কিন্তু কবে থেকে ওর এই অভিনয়ের শুরু?

তা জানতে হলে ওই মাস আষ্টেক পিছনে সরে যেতে হয়।

যখন নাকি লোকটা আস্ত এটা মানুষ ছিল, বউ ছিল তার, বাসা ছিল।

বউ তার জন্যে পরিপাটি করে রেঁধে রাখত,—আর নিজে পরিপাটি হয়ে বসে থাকত, ও যখন ঘরে ফিরত, ওকে মনে হতো সম্রাট।

এই সম্রাটের জীবনেই হয়তো জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো লোকটা, যেমন আরও হাজার হাজার লোক দিচ্ছে। অসাধুতা করছে, অজ্ঞতা করছে বলে কে আর সাম্রাজ্য হারাচ্ছে?

হারজিত শুধু ধরা পড়ায়, আর না পড়ায়।

লোকটা ধরা পড়ে গিয়েছিল।

আর বড়ো মোক্ষমই ধরা পড়েছিল।

একেবারে সরাসরি মালিকের সামনে।

কাছার খুঁটে হোমিওপ্যাথি শিশিতে 'কুন্তলবিলাস' বেঁধে নিয়ে সরে পড়া নয়, খদ্দেরের কাছে মকরধ্বজের পুরিয়া পাচার করছিল।

খদ্দেরকে বিদায় করে সিঁদুর আর মিহি ইটের গুঁড়ো মিশিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করছিল, অসময়ে এসে পড়লেন মনিব।

জেরার চোটে বেরিয়ে গেল সব।

অনেকদিন ধরেই এ ব্যবসা চলছিল।

সালসার বোতলে আধাআধি চিরেতার জল, 'বজ্রচূর্ণ মাজনে' স্রেফ ঘুঁটের ছাই, ইত্যাদি আরও অনেক কিছু প্রকাশ পেয়ে গেল। ওই খদ্দেরটিই এসব বুদ্ধি দিয়েছে অজিতকে, হাতে ধরে শিখিয়েওছে। অর্ডার দিয়ে যায়, অজিত সাপ্লাই করে।

লাভজনক ব্যবসা।

তিল কুড়িয়ে তাল।

কর্তা বললেন, 'তুমি অনেকদিন আছ। তোমায় খুব বিশ্বাস করতাম। তাই পুলিশের হাতে আর দেব না, এই দণ্ডে আমার এখান থেকে বেরিয়ে যাও, জীবনে আর মুখ দেখিও না।'

চাকরি গেল।

পকেটে একটাকা এগারো আনা পয়সা সম্বল।

এতদিনের সহকর্মীদের সামনে থেকে ঘাড় হেঁট করে বেরিয়ে আসতে হল।—মনে হল, পৃথিবী দ্বিধা হও।

যে লোকটা তার কুমন্ত্রণাদাতা, তাকে মালিক আটকে রেখেছেন, নইলে হয়তো কিছু আদায় হত। অনেক পাওনা ছিল তার কাছে। সে এল না। অথচ পৃথিবীরও দ্বিধা হবার নাম নেই।

এই মুখ নিয়ে কি করে মলিনার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে অর্জিত? এ খবর কি চাপা থাকবে? চাকরি যাওয়ার খবর চাপা থাকবে না, যাবার কারণও চাপা থাকবে না। মাধববাবুর বাসার সবাই জেনে ফেলবে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভদ্র আর সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত অজিত ভট্টাচার্যের এই কাজ! এই স্বরূপ!

না, এ মুখ নিয়ে বাসায় ফেরা যায় না।

অথচ এই একটাকা এগারো আনা পয়সা সম্বল করে এতবড়ো পৃথিবীতে কোথায় পাড়ি দেবে?

হাওড়া স্টেশনের একটা বেঞ্চে বসে অনেকক্ষণ ভাবল অজিত, তারপর একটা প্লাটফরম টিকিট কেটে ঢুকে পড়ে মারাত্মক ভীড় সম্বলিত একটা থার্ড ক্লাস কামরায় উঠে পড়ল।

বিনা টিকিটের যাত্রীর ভাগ্যে যে কত লাঞ্ছনা জোটে, সে আর তখন মনে পড়ল না তার। বিনা টিকিটে উঠে পড়ার বাহাদুরীতেই মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

মনে পড়ল না, চুরির অপবাদে চাকরি হারিয়ে মুখ দেখাতে পারবে না বলে বাড়ি ফেরেনি সে। মনে পড়ল না, একটু আগে মনে মনে কান মলেছিল সে যে, জীবনে আর অসততা করব না বলে।

আপাতত যে মাধববাবুর বাসার কারও সামনে পড়তে হল না এটাই পরম লাভ মনে হল।

ওর না ফেরাটা মলিনার ওপর কি আঘাত হানবে, তা স্পষ্ট খেয়ালে এল না। একবাড়ি লোকের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলল মলিনাকে।

ভীড়ে ঠেলাঠেলি গাড়িতে একটা কোণে গুঁজে বসে রইল, আর ট্রেন ছাড়তেই বলল, 'দুর্গা দুর্গা'।

কোথায় যাবে জানে না।

টিকিট চেকার যদি না ধরে, তাহলে অনেক দূর পাড়ি দেওয়া যাবে। যদি ধরে, কী অদৃষ্টে আছে কে জানে?

আচ্ছা, পাগল সাজলে কেমন হয়?

চমৎকার! চমৎকার ! এতক্ষণ কেন মনে পড়েনি!

অজিতের মনে হল জগতের সমস্ত রকম অসুবিধে আর বিপদ, অপমান আর লজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার এর থেকে সহজ উপায় আর নেই।

মনে হল এ চালটা মাধববাবুর বাসাতেও চালালে মন্দ হত না!

যাক।

এখন তো অজানা সমুদ্রে পাড়ি!...মাসের বাজার করা আছে মলিনার। মাসের মাইনেটাও আছে বাড়িতে। এক্ষুণি চট করে কষ্টে পড়বে না।

এখন পাগলের ভঙ্গিটা রপ্ত করা!

তা এখন থেকেই শুরু করলেই বা মন্দ কি?

সেই থেকে পাগলের ভূমিকা।

ক্রমশ যেন এইটাই স্বাভাবিক হতে চলেছে।

এখন আর গায়ে ছাই-কাদা মেখে, অথবা গালে-মুখে লাল-নীল রং মেখে নিতে বুকটা ফাটে না, যার তার জামায় টান দিয়ে বলে উঠতে দ্বিধা হয় না, 'এই শালা, আনা কতক পয়সা দে দিকি, পেটের মধ্যে খাণ্ডব দহন হচ্ছে।'

পাগলে গাল দিলে কেউ রাগ করে না। বরং কথার চার ফেলে ফেলে আরও গালমন্দ আদায় করে, তবে দু' আনা চার আনা পয়সা দেয়।

নেহাত যেদিন না জোটে, গিয়ে বসে পড়ে কোনো 'ছত্রে', পেটটা ভরে যায়।

ছত্রের খাওয়ায় পেটটা ভরলেও হয়তো মনটা ভরে না। এসে দাঁড়ায় কোনো খাবারের দোকানের সামনে, গিয়ে বলে 'ও দাদা, খুব যে খোসবু বার করেছ, চারটি ছুঁড়ে মারো না, এইখানে রাখি।'

বলে আর পেটটা দেখায়।

পাগলের মতো কথা এখন আর ভেবে ভেবে সাজাতে হয় না ওকে, কথা আপনিই এসে হাজির হয় ঠোঁটের আগায়।

লজ্জাও হয় না।

এটা যে একটা বেশ মজাদার পেশা, সেটাই সে ধরে নিয়েছে।

আর এটাও ধরে নিয়েছে, এ পেশার পক্ষে কাশীই হচ্ছে উপযুক্ত ক্ষেত্র।

চোর-জোচ্চোর, ভিখিরি, পাগল, আর ধর্মের ষাঁড় এই জীবগুলোর জন্যে সদাব্রত খোলা আছে এখানে।

তাই শুধু যে পেটটাই ভরে যাচ্ছে তা নয়, পকেটেও কিছু কিছু উদ্বৃত্ত হচ্ছে।

তবে ওই পয়সাগুলো লুকিয়ে রাখার জন্যে অনেক প্যাঁচ কষতে হয়।

মণিকর্ণিকার ঘাটে যে সাধুটি রাতদিন ধূনী জ্বালিয়ে বসে থেকে ভস্মের পাহাড় জমিয়ে ফেলেছে, তার সেই ভস্ম-পাহাড়ের খাঁজে এক খুরি পয়সা-টাকা আছে পাগলার, আর ঘাটের ওপর যে অশ্বত্থ গাছটা অনেক ঝুরি নামিয়ে বসে আছে অগুনতি বছর ধরে, তার একটা ঘন অন্ধকার ডালে ঝোলানো আছে একটা কৌটো ভর্তি টাকা। শ্মশানে কুড়িয়ে পাওয়া ময়লা ন্যাকড়ার টুকরো দিয়ে বেঁধেছে, পাছে কারও চোখে পড়ে যায়।

আর এসব করে সে রাতবিরেতে।

অথচ লোকটা নাকি একদা জাতে বামুন ছিল, নিরীহ ভদ্রলোক ছিল।

বাসায় কারও সঙ্গে একদিনের জন্যে বচসা হত না তার।

এই জীবনের মধ্যে আটকে গেছে সে।

যদিও ভাবছে অভিনয় করছি।

তবে এক এক সময় বউয়ের জন্যে মন বড়ো উচাটন হয়ে ওঠে।

তখন এই ঘৃণ্য খোলসটাকে বড়ো অশুচি মনে হয়। তখন এই পেশাটাকে নারকীয় মনে হয়।

আর তখনই প্রাণটা ছটফটিয়ে ওঠে সেই বিস্মৃতপ্রায় সহজ সুস্থ জীবনটার জন্যে।

ইচ্ছে হয় বউটাকে কোনো প্রকারে একবার কাশীতে এনে ফেলে। তারপর সব সহজ হয়ে যাবে।

কাশীতে থেকে বুঝেছে, রাজ্যটা যে মা অন্নপূর্ণার বলা হয়, সেটা ভুল বলা হয় না। উপোসী এখানে থাকতে হবে না।

বামুনের মেয়ে তো, একটা কোনো ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। কিছু না হোক, একটা ঠাকুর মন্দিরে ফুল জল ফেললে, মন্দির ধোয়া মোছা করলে, পুজোর বাসন দু'খানা মাজলেও পেটটা চলে যাবে।

আর—

কে জানে বউটার কী হচ্ছে! সারাদিনের ছলনার পর রাত্রে কোনো মন্দিরের আনাচে কানাচে শুয়ে ভাবে পাগলা।

অবিশ্যি, সামান্য যা কিছু সোনা-রূপো, কাঁসা-পেতল ছিল, তাতে চলেছে কিছুদিন। তারপর? তা অতগুলো ঘর কি আর এক মুঠো করে চাল চাঁদা দিয়ে একটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখছে না? আর বাড়িওলা?—ওর অবস্থা দেখে কি আর ঘর ভাড়াটা মাপ করছে না?

পাগলামির নেশায় সত্যিই যেন পাগল হয়ে থাকি আমি। একখানা চিঠিও তো লিখতে পারতাম! অন্তত বেঁচে আছি, এই খবরটুকু দিয়ে! কিন্তু—

আমি পালিয়ে আসার পর নিশ্চয়ই ওরা আমার ওই আপিসে খোঁজ নিয়েছিল, আর যা শোনবার শুনেছিল। 'চোর স্বামী' এই ঘেন্নায় গলায় দড়ি দেয়নি তো মলিনা? যে মানিনী!

এই কথাটা যেই মনে আসে, সত্যিই যেন মাথার মধ্যে পাগলেরই মতো হিজিবিজি হয়ে যায়। আর চিঠি লিখতে সাহস হয় না। ভাবে যা থাকে কপালে, গিয়েই পড়ব একবার। আশেপাশে জিগ্যেস করব, মলিনা বেঁচে আছে কিনা। তারপর যা আছে অদৃষ্টে।

এখন চিঠি দিলে হয়তো বিপদই বাড়বে। বিপদই হয়েছে চিন্তা।

এখন দরকার কিছু নগদ টাকার।

ভেবে চিন্তে পাড়াটা বদলায়।

পাগলামীর ভোলটাও বদলায়।

আর সেই গায়ে ছাই মেখে হি হি করে হেসে লোকের মনোরঞ্জন করে না। চেয়ে চিন্তে একটা ধুতি আর শার্ট জোগাড় করেছে, পরে মন্দিরের রাস্তায় আসে, আর কোনো যাত্রী নামলেই কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'বিলেত থেকে এলেন তো বাবু? দেশটা মন্দ না, কী বলেন? তা আমারও একবার যাওয়া দরকার। পরিবার সেখানে পড়ে আছে, আনতে পারছি না, এরোপ্লেনের ভাড়াটা জোগাড় হচ্ছে না, গোটা পাঁচেক টাকা ছাড়ুন না, বাবু?'

অধিকাংশই অবশ্য ব্যঙ্গ হাসি হেসে সরে যায়, কেউ কেউ মজার মজার কথা শোনে জিগ্যেস করে করে।

বলে, 'তা বউ বুঝি মেম? এরোপ্লেন ছাড়া চড়বে না?'

'আজ্ঞে, ঠিকই বলেছেন। মেমই। বাঙালির মেয়ে হয়েও মেম! বুঝলেন কি না বিলেত গেলে যা হয়, মেম দেখে দেখে মেম বনতে সাধ হয়। আমি চাষাভুসো বামুন, আমার পরিবার হয়ে তুই—'

ওরা হেসে হেসে বলে, 'তা তুমিই বা হঠাৎ পরিবার নিয়ে বিলেত গেলে কেন?'

'কেন?'

পাগল চোখ মটকায়, আঙুল মটকায়, লজ্জা লজ্জা মুখে বলে, 'গেলাম কি আর সাধে? পরিবারের জেদ, বিলেত দেখবে, সাহেব-মেম দেখবে, চুরি-জোচ্চুরি যে করে হোক টাকা জোগাড় কর।'

'নে শালা তুই মর।'—বউয়ের জন্যেই যে তার এত জ্বালা সেই কথাই বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

তারপর হঠাৎ সুর ফের্তা করে বলে, 'তা যাই বলুন বাবু, দেখবার মতোন দেশ বটে!'

লোকে হাসির কথার দাম স্বরূপ দেয় চার আনা আট আনা।

কিন্তু কে জানে কথাগুলো ওর শুধুই বানানো কি না। না কি সাজা পাগলের পাগলামি আসলে অবয়ব নিচ্ছে?

সেদিনও এমনি ধরেছে একজনকে। গড়গড় করে বলে চলেছে, 'সব দেশ দেখলাম বাবু—চিন, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া। বিলেতের মতন এমন দেশ দেখলাম না। বিশ্বাস না হয়, চলুন।'

লোকটা হেসে বলে, 'তুই বুঝি ঘুরে এসেছিস!'

'শুধু ঘুরে?' পাগল দু'হাতের দশটি আঙুল ছড়িয়ে বলে, 'পাক্কা দশটি বছর কাটিয়ে এসেছি। পরিবার বলল, 'তুমি এখন যাচ্ছ যাও, আমি আর দু'টো দিন থেকে যাই।' তা বলব কি বাবু, পয়সার অভাবে পরিবারকে আনা হচ্ছে না।'

লোকটা আরও হেসে ওঠে, 'তা এত দেশ বেড়ালি, পয়সা কে দিল? হঠাৎ সে সব পয়সা গেল কোথায়?'

'ওই তো, ওই বেড়িয়ে বেড়িয়েই তো বিলেত গেছি, এন্তার চাল ফলাচ্ছি, ষোলো ঘোড়ার গাড়ি ভিন্ন চড়ি না, ফল ফললো! পকেট গড়ের মাঠ! এখন এই দেখুন—ভদ্দরলোকের ছেলে, পায়ে এক জোড়া জুতো নেই।...আর বিলেতের এমন আইন, পায়ে জুতো নেই তো দাও ঠেলে হাজতে।

'দিন না বাবু গোটা দশ টাকা—একজোড়া জুতো কিনে ফেলি—'

লোকটা হয়তো আরও মজা করত, হঠাৎ বিশ্বনাথের গলি থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোক।

পাশের লোককে বললেন—'কি রে যতীন?'

যতীন মৃদু হেসে বলে, 'কিছু না বাবু, এক ব্যাটা পাগল। বলে, বিলেত যাবে—'

কথা শেষ হয় না, হঠাৎ পাগলটা সামনে দাঁড়ানো মোটর গাড়িটাকে পাক দিয়ে ডিঙিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে চেষ্টা করে।

কিন্তু পালাতে পারে না।

পথ আগলানো এক ষাঁড়ের ধাক্কায় ছিটকে আছাড় খেয়ে পড়ে যায়।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আচরণটা পাগলজনোচিতই।

কিন্তু প্রৌঢ় ভদ্রলোক যেন দিশেহারা হয়ে এগিয়ে যান। হাত ধরে তোলেন পাগলকে। এবং পাগলের একরাশ দাড়ি গোঁফ সম্বলিত মুখটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, 'কে তুই?'

পাগল হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে।

মুখ নীচু করে বলে, 'কেউ নেই। একটা পাগলা-ছাগলা। ছেড়ে দিন বাবু।'

ভদ্রলোক কিন্তু ছেড়ে দেন না।

বরং আরও শক্ত করে চেপে ধরে বলেন, 'তুমি অজিত ভট্চায না?'

চেষ্টা করেছিল কিছুক্ষণ।

বলেছিল—'আমি বাবু, সাহেব মানুষ, ভট্চাযের খবর জানি না।' বলেছিল—'বিলেত যাবার টাকাটা জোগাড় হলেই চলে যাই বাবু—পরিবার সেখানে পড়ে আছে!'

কিন্তু বেশিক্ষণ পারেনি।

হাউ হাউ করে কেঁদে পা জড়িয়ে ধরেছিল।

যোগাযোগটা অদ্ভুত।

কাশীতে বেড়াতে এসেছেন 'কুন্তল বিলাসের' মালিক। যোগেন তাঁর সরকার। যোগেনের গুপ্তচরবৃত্তিতেই মালিক ধরতে পেরেছিলেন ওকে।

মালিক যেন বড়ো বেশি মর্মাহত হয়েছেন।

হয়তো অজিতের এই দুর্দশা দেখে তাঁর মনে হচ্ছে সেদিনের ব্যবহারটা বড়ো বেশি নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিল। হয়তো মনে হয়েছে, লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়েছিলাম আমি। গরিব লোক, লোভ সামলাতে পারেনি, একবারের দোষ ক্ষমা করা উচিত ছিল। অতগুলো লোকের সামনে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়ে লোকটার জীবনটাই নষ্ট করে দিলাম।...

'আমার ব্যবহারে পাগল হয়ে গেছে লোকটা!'

এই মর্মদাহ তাকে পীড়িত করতে থাকে।

আসলে অজিতকে ভালোওবাসতেন। আর বাসতেন বলেই বোধ করি অত বেশি রেগেছিলেন তার অবিশ্বাসের কাজে।

জোর করে গাড়িতে তুলে বাড়ি নিয়ে গেলেন।

আর নাইয়ে, খাইয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, বস্তুত পুরো পাগল নয়। লজ্জায়, ঘেন্নায় পালিয়ে এসে আর পথে পথে ঘুরে ক্ষ্যাপাটে হয়ে গেছে।

যে জীবনটা নষ্ট হবার জন্যে তিনি নিজেই কিছুটা দায়ী, সে জীবনটাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না তিনি? ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না আর একবার সুযোগ দিতে?

'চল আমার সঙ্গে।'

বললেন মনিব।

অজিত মাথা হেঁট করে বলল, 'এ মুখ আর কলকাতায়—'

'আরে বাবা, রাগের মাথায় বাপ জ্যাঠা, মাস্টার মনিব অমন কত বলে। সেইটা ধরে, মাথা খারাপ করে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে? ছি ছি! তোমার স্ত্রী আছে না?'

'ছিল তো—'

'ছিল মানে?'

'মানে, আর তো খবর নিইনি!'

'না না, অজিত কাজটা ভালো করনি। এতদিন কিভাবে কাটছে মেয়েটার, কে জানে। তুমি এই করে বেড়াচ্ছো জানলে, খোঁজখবর নিতাম। এখন চল আমার সঙ্গে, কাজকর্ম করবে।'

'আবার কাজকর্ম!'

বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকায় অজিত।

মালিক জোর দিয়ে বলেন, 'কেন করবে না? মানুষ তো ভুল করেই। এবার নতুন করে—'

কর্পূরের মতো উবে যাওয়া অজিত ভট্চায তবে নতুন করে জীবন শুরু করতে আবার দেশে ফেরে।

কিন্তু কোথায় তার সেই জীবন?

মাধব ঘোষের বাসার তিন কুড়ি লোক এই হতভাগ্যকে ঘিরে বসে নিখুঁত নির্মমতায় জানিয়ে দেয়, 'নেই সে বস্তু।' বুঝিয়ে দেয়, 'ছিলই না কোনোদিন।'

থাকলে কখনও এমন কর্পূরের মতো নিমেষে উবে যায়?

'দু'টো মাস তর সইল না—' সুখদা সখেদে বলে, 'এতগুলো মানুষের উপরোধ অনুরোধ ঠেলে সবাইয়ের নাকের ওপর দিয়ে ছোঁড়ার হাত ধরে গটগটিয়ে বেরিয়ে গেল!'

রেলেকাটা মানুষটার কথা কেউ তুলল না। তারা যে স্পষ্ট দেখে এসেছে অজিতের মড়া, সে কথা বলল না।

অজিতের জন্যে তারা শয়নে স্বপনে পথ চেয়ে বসেছিল সেই কথাই বলল।

অনেকক্ষণ বিহ্বলতার ঘোর ছিল, তারপর—

অজিত ভাবল, আশ্চর্য আমি! সামান্য একটু 'চোর' অপবাদে দেশত্যাগ করেছিলাম, গায়ে ছাই মেখে পথে পথে ঘুরেছিলাম, আর এখন স্ত্রী কুলত্যাগ করেছে শুনেও দিব্যি বসে আছি। এতগুলো লোককে মুখ দেখাচ্ছি। এরা চা দিয়েছিল, তাও খেয়েছি। এরা বলেছে, 'সে কি কথা, যাবে কোথায়? কেনই বা যাবে? আবার বে'থা কর, ঘরসংসার কর,' তাও শুনছি বসে বসে।

অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'নগেনবাবু সেখানে গিয়েছিলেন বললেন না?'

'গিয়েছিলেন তার কি? সে বাসায় কি আর আছে নাকি? যেই জানাজানি হয়ে গেছে, ছেড়ে দিয়ে বেলেঘাটায় না কোথায় চলে গেছে। বলে পর্যন্ত যায়নি। পাড়ার লরি গাড়ির ড্রাইভার গিয়েছিল, বাড়ি উঠ্‌নো জিনিস নিয়ে, সেই বুঝি বলেছিল। কিন্তু তার খোঁজ করে আর কি হবে?' দাসগিন্নি আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলেন, 'মিথ্যে একটা খুনোখুনির দায়ে পড়া বৈ তো নয়! পুরুষের রক্ত তো গায়ে আছে? তার চেয়ে—'

কিন্তু অজিত কি খুনোখুনির কথা ভাবছে?

না।

তেমন প্রতিহিংসার তীব্রতা খুঁজে পাচ্ছে না অজিত মনের মধ্যে। সে শুধু একবার দেখতে চায় মলিনাকে। দেখতে চায়, কি রকম চেহারা হয়েছে মলিনার।

কি রকম হয়ে যায় হঠাৎ অসতী হয়ে যাওয়া মেয়েমানুষ!

আর সেই অন্যরকম হয়ে যাওয়া মলিনাকে একবার শুধু প্রশ্ন করতে চায়—'মলিনা তুমি এই?'....বলতে চায়—'মলিনা, এইটাই কি তুমি? তবে আগের সেই মানুষটা?...যে আমার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকত? আমার অস্তিত্ব নিয়েই বেঁচে থাকত?

সে কে?'

মানিকতলার সেই সরু গলির অন্ধকার একতলার ছোট রান্নাঘরটায় বসে মলিনাও ভাবছিল, সে তবে কে?

মাধব ঘোষের বাসায় দাওয়ায় বসে যে মলিনা রান্নার সরঞ্জাম আর মহিমা নিয়ে বসত, সেই মলিনাই কি আমি?

তবে অজিত ভট্‌চায নামের সেই মানুষটা এসে খেতে না বসলেও কিছু এসে যাচ্ছে না কেন আমার? কেমন মনে হচ্ছে না সব মিথ্যে?

রাজ রোজ নতুন নতুন রান্নায় উৎসাহ আসে কোথা থেকে আমার? আর একটা মায়াবী রাক্ষস যখন উৎসাহের জোয়ার বইয়ে সেই রান্না তারিফ করে খায়, তখন আমার প্রাণটা পুলকে ভরে ওঠে কেন?

কই কিছুতেই তো মায়াবীটাকে আমার 'ভাই' বলে মনে হয় না! বারেবারে কেন অজিত ভট্‌চাযের মুখের সঙ্গে মুখটা গুলিয়ে যায় ওর?

তবে কি তরোয়ালের খেলায় হার হবে আমার? কেটে টুকরো হয়ে যাব তার ধারে?

আর ওই ছেলেটা!

সে যে সারারাত জেগে পায়চারি করে, সেকথা টের পাওয়া যায় পাশের ঘর থেকে। আর

সকালে এসে সেই না-ঘুমানো ক্লিষ্ট মুখে হাসি ফুটিয়ে সে শুধু বলে, 'আজ কি রাঁধবে বল? কি আনব?'

ওর পয়সা নেই।

এই বাসাটুকু ভাড়া করতে আর দু'টো লোকের ভাত যোগাতেই সারা হয়ে যায় ও। তবু ছোটোখাটো ঘর সাজানোর জিনিস এনে জড় করে ও, আনে গেরস্থালীর অদরকারি টুকিটাকি।

বারণ করলে হাসে।

বলে, 'সংসার জিনিসটা যে কি, তার স্বাদ তো জানিনি কখনও। তাই সাধ হল।'

মলিনা হাসি মুখে সেই হাসিমুখটা সহ্য করবে? মলিনা কিছু না দিয়ে শুধু নিয়েই চলবে?

কেন?

অজিত ভট্চায নামের সেই ছায়াটার অনুশাসনে?

কিন্তু এই মলিনা তো মাধব ঘোষের বাড়ির সেই মলিনা নয়!

এ তো অন্য আর একজন। এ তো একটা থিয়েটারের অ্যাকট্রেস!

অবিরত অন্যের লেখা পার্ট প্লে করে চলেছে। তাই হঠাৎ একদিন যখন বাড়িওলা মানিক দাসের গিন্নি বেড়াতে আসেন, অথবা সরেজমিনে তদন্ত করতে আসেন বাড়ি কেমন ভাবে রেখেছে, আর দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন, তখন মলিনা অম্লান বদনে বলে, 'ওই তো, ওই পরিষ্কার পরিষ্কার বাতিকেই ম'লাম মাসিমা! বলব কি দু'টি মানুষই সমান! চিরটাকাল ওই বাড়ি পরিষ্কারই ধ্যান-জ্ঞান।'

যেন দু'টি মানুষে চিরটাকাল একসঙ্গে থেকেছে।

দাসগিন্নি সে কথা বুঝতে পারবেন এমন হতে পারে না। তিনি শুধু বলেন, 'এই রকমই চেয়েছিলাম আমরা। শুধু স্বামী-স্ত্রী, কোনো ঝামেলা নেই।'

এই চলছে।

এই অভিনয় উৎরোনো।

তবে আর কি করে বলা যায় সেই মলিনাই এই লীনা?

ছিল মলিনা ভট্চায, হতে হয়েছে লীনা মিত্র। নাপিত পুরুত ডেকে বদল নয়। রেজিস্টারি অফিসে গিয়ে বদলও নয়, শুধু শুধু বদল, অভিনয়ের বদল।

আর সেই বদলের সঙ্গে সঙ্গে ওর কথার ধরন বদলাচ্ছে, চিন্তার ধারা বদলাচ্ছে।

বারো ঘরের ভাড়াটেদের মধ্যে যখন থেকেছে উঁচুনাকী মলিনা, তখন চিন্তার ধারা ছিল তার শুধু ওদের থেকে বিশিষ্ট হওয়া! ওরা রাতদিন গাধা-খাটুনী খাটে, রাতদিন একবস্ত্রে কাটায়, যে বস্ত্রে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে, অসহ্য হলে সাবান সোডার জলে সেদ্ধ করে নিজেরাই কেচে নেয় ওরা। পুরুষদের জামাটা কাপড়টাই শুধু ধোবার বাড়ির মুখ দেখে।

মলিনার গায়ে সর্বদা ব্লাউস সায়া, আর তাদের গায়ে ময়লার ছোপ ধরতে না ধরতে ধোবার বাড়ি চালান হয়।

সংসারের গাধা-খাটুনী কি মলিনাই খাটত না? কিন্তু নিঃসন্তান জীবনের সুবিধায় অবলীলায় সব করে নিত। তারপর ফিটফাট হয়ে বেড়াত।

চুলে গামছা চেপে চেপে পাতা কাটত মলিনা, রাঙতা দেওয়া টিপ কিনে পরত।

তখন মলিনার কথার ধরন প্রায় ওদের মতোই ছিল। স্বপ্নার মা, দাসগিন্নি, সুখদা।

এখন যেন আর একটা ভাষা এসেছে মলিনার মুখে। মেয়েমানুষদের সঙ্গচ্যুত হয়ে গিয়ে মেয়েলি ধরনের কথাগুলো বুঝি ভুলেই গেছে মলিনা। ভুলে যাচ্ছে আটপৌরে কথা।

কথা বলছে পোশাকী ভাষায়।

সে কথার ভঙ্গিতে রহস্যের ব্যঞ্জনা।

ছুটির দিনে সুধানাথ যদি কোথাও থেকে ঘুরে এসে বলে, 'আর একবার চা হলে কেমন হয়?'

মলিনা বলে, 'খাওয়ার সঙ্গী চাইলে হবে না, না হলে হবে।'

সুধানাথ বলে, 'অমন চায়ের মুখে ছাই।'

মলিনা বলে, 'এ তো ভারী আবদার! সঙ্গী তা হলে জোটাও?'

সুধানাথ গম্ভীরভাবে বলে, 'ভগবান তো দয়াপরবশ হয়ে দিয়েছেন জুটিয়ে।'

মলিনা বলে, 'ভগবানের বালাই নিয়ে মরি। শ্মশান থেকে একখানা আধপোড়া কাঠ এনে তাকে পুতুল বানিয়ে ধরে দিয়েছেন সঙ্গী বলে।'

সুধানাথ বলে, 'হতভাগার ভাগ্যে সেটুকুও সইলে হয়। দুর্ভাগাদের তো পোড়া শোলমাছও জলে পালায়।'

মলিনা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, 'অধিক দুর্ভাগাদের আবার তাও পালায় না, গলায় কাঁটা বিঁধিয়ে ঝুলে থাকে।'

হয়তো সুধনাথকে বলে মলিনা, 'তা তুমি সুদ্ধু নিরিমিষ খাবে কেন? মাছ আনো বাপু, ঝাল ঝাল করে সর্ষের ঝোল রেঁধে দিই—'

সুধানাথ বলে, 'আমার শর্ত তো জানো?'

'জানি। তা বলে পাগলের পাগলামী মানতে রাজী নই। মাছ না আনলে রাগারাগি করব।'

'করো! সেটাই বা মন্দ কি! তবু বোঝা যাবে বাড়িতে দু'টো জ্যান্ত প্রাণী আছে।'

'বেশ তা হলে আগে যেমন করতে, তাই কর। সকালে সাত্ত্বিক আহার, রাত্তিরে রেস্টুরেন্টের মাংস পরোটা!'

'দায় পড়েছে আমার রাত্তিরে 'খাই খাই' করে দু' মাইল ছুটতে।'

মলিনা রাগ করে বলে, 'তার মানে আমাকে চির অপরাধিনী করে রাখা। দেখানো যে, দেখো তোমার জন্যে কত সর্বত্যাগী হয়েছি আমি।'

সুধানাথ কিন্তু এতেও রাগ করে না। বলে, 'বাঃ তোমার তো বুদ্ধিটা খুব প্রখর! ভেতরের রহস্য এতো বুঝে ফেলেছ?'

তা হয়তো সুধানাথের কথার বাঁধুনীতে মলিনাও শিখেছে বাঁধুনী।

আর চিন্তাতেও বুঝি সেই নতুনত্বের বাঁধুনী।

এখন আর মলিনা ঘুম থেকে উঠে ভাবে না, আজ কয়লাগুলো সব ভেঙে ফেলব, আজ জড়ো করা জামাকাপড়গুলো সাবানে কেচে ফেলব, আজ কেটে-রাখা ব্লাউসটা সেলাই করে ফেলব। অথবা এ ভাবনাও আসে না তার, ছাপা ছিটের শাড়িটা ছিঁড়ে গেছে, কেটে জানলার দু'টো পর্দা বানালে হয়, বাসনওয়ালি এলে জিগ্যেস করতে হবে ছেঁড়া পাঞ্জাবী নেয় কি না।

না, এসব চিন্তা আর নেই এখন মলিনার।

মলিনা এখন ঘুম থেকে উঠে এই ধরনের কথা ভাবে, আজ দু'খানা মোচার বড়া করতে হবে, আমার জন্যে মানুষটা নিরিমিষ খেয়ে সারা হচ্ছে।...

মুখ ফুটে সেদিন বলেছিল, ওর মা মরে পর্যন্ত নাকি সরুচাকলি খায়নি, দুটো চাল ডাল ভিজিয়ে রাখতে হবে, আজই করে দেব।

সামান্য দু'টো নিরিমিষ রান্না, তাই খেয়েই কত খুশি, যেন বর্তে যাচ্ছে। অথচ তার বিনিময়ে কত দিচ্ছে তার হিসেব করবারও সাহস নেই মলিনার।

শুধুই কি খাওয়া পরা?

শুধুই আশ্রয়? শুধুই কি অর্থসামর্থ্য?

জীবনটা বিকিয়ে দেয়নি?

সমগ্র ভবিষ্যৎ?

মান সম্ভ্রম, সমাজ পরিচয়?

আত্মীয়জনের দিকে যায় না আর ও, পুরনো আলাপীদের ছায়া মাড়ায় না, নির্বাসন দণ্ড নিয়ে বসে আছে।

অথচ আমি ওকে অহরহই দিচ্ছি মুখনাড়া, দিচ্ছি ঝঙ্কার। বলছি, 'আমাকে খাঁচায় পুরে রেখেছ।...আমায় স্বাধীনতার ভাত খেতে দিচ্ছ না।'

রাগ করে ও একদিন বলে বসেছিল, 'ও স্বাধীনতার চিন্তা তো তোমার লোকের বাড়ি রান্না করা? তা বেশ তো মনে কর না তাই করছ। মিটে যাবে বিবেকের দংশন।'

তখন মলিনাকে বাধ্য হয়ে ভ্রূভঙ্গি করতে হয়েছে। অলৌকিক একটু হাসতে হয়েছে।

বলতে হয়েছে, 'আহা তাতে তো মাইনে আছে গো! এ যে বিনি মাইনের খাটুনি।'

'গরিবের বাড়িতে কাজে ঢুকলে এই দুর্দশাই ঘটে।'

বলে নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকেছিল ও মলিনার মুখের দিকে।

যদিও মলিনার সেই পাতা কাটা চুল আর পরিপাটি টিপ পরা উজ্জ্বল মুখ আর নেই এখন।

চুল বাঁধার পাট গেছে। একরাশ জট পড়া চুল হাতে জড়িয়ে জড়িয়েই চলছে।

কিন্তু কদাচ কখনও চুলটা জট ছাড়াতে বসে আর্শীতে দেখতে দেখতে মনে হয় মলিনার মুখটা যেন আজকাল তার থেকে বেশি ভালো দেখাচ্ছে। অন্য ধরনের ভালো।

রাস্তায় ঘাটে যে সব ফ্যাসানি মেয়েদের দেখেছে মলিনা, মলিনার মুখে যেন তাদের ছাপ। তাছাড়া সুধানাথও তো কই বলে না চুলে তেল দাও না কেন? বাঁধো না কেন?

মলিনা তাই চুলে আর তেল দেয় না।

অথচ সুধানাথ ভাবে মলিনা কৃচ্ছ্রসাধন করছে।—মলিনার চিন্তার ধারা বদলেছে বৈ কি।

আচ্ছা, এই মলিনাকে কি লোকে সতী মেয়ে বলবে?

অকস্মাৎ কর্পূরের মতো উবে যাওয়া স্বামীর জন্যে যে কেঁদে কেঁদে নিজকে কর্পূরের মতো শেষ করে ফেলছে না, পরপুরুষের ভালো-লাগা, ভালো-না-লাগার চিন্তায় দিনের অধিকাংশ ব্যয় করে ফেলছে, এ মেয়ে অসতী ছাড়া আর কি?

হঠাৎ একটা পোড়া গন্ধে চমক ভাঙল।

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা গলার স্বরেও।

'এই সেরেছে, রাঁধতে রাঁধতে ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? কি পুড়ল?'

মলিনা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিচিত্র একটু হেসে বলে, তোমার কপাল!'

'আমার কপাল!'

হেসে ওঠে সুধানাথ, 'সে কি তোমার ওই কড়াতে চাপানো ছিল নাকি?'

'ছিলই তো! ওই কপালকে লোহার কড়াইতে করে গনগনে আগুনে চড়িয়েই রেখেছি তো সর্বদা, পুড়ছে আঙার হয়ে।'

সুধানাথ একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসে বলে, পোড়া কপালই বা মন্দ কি? বেগুন পোড়াও তো ভালোবেসে খায় লোকে।'

'হতভাগা, অভাগারা খায়।'

সুধানাথ একটু ক্লান্ত হাসি হেসে বলে, 'তা সবাই কি আর ভাগ্যবান হয়? এও ভালোই।'

হঠাৎ অলসভঙ্গি ত্যাগ করে রান্না ছেড়ে উঠে আসে মলিনা।

তীব্রস্বরে বলে, 'ভালো থেকে আমাদের কী হবে বলতে পার?'

সুধানাথ দাঁড়িয়ে ওঠে।

চমকে ওঠে।

বলে, 'কী বলছ?'

'যা বলছি তা বুঝতে পারবে না এত খোকা তুমি নও। আমি বলছি আমাদের কি আর কেউ সমাজে নেবে? প্রাণপণ করে ভালো হয়ে থাকলেও কেউ ভালো বলবে? আমরা যে কী করে কাটাচ্ছি, কেউ বুঝবে? বিশ্বাস করবে?'

হাঁপাতে থাকে মলিনা।

সুধানাথ উত্তর দেয় না।

সুধানাথ একটা অদ্ভুত কাজ করে। সুধানাথ দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে খিলটা বন্ধ করে দেয়।

পোড়া তরকারি সুদ্ধ কড়াটা নামানো থাকে, পড়ে থাকে মাখা ময়দা। উনুনটা জ্বলে জ্বলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মলিনা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

মলিনা বুঝতে পারে না কার কাছ থেকে পালাল সুধানাথ! নিজের কাছ থেকে, না মলিনার কাছ থেকে?

সন্ধ্যা গড়িয়ে অনেকটা রাতে গিয়ে ঠেকে।

মলিনার হঠাৎ অজিতের সেই না-ফেরার রাতটা মনে পড়ে যায়। তেমনি বুক ছম ছম রাত যেন এটা! তেমনি ভয়ানক একটা বিপদ যেন হাঁ করে তাকে গ্রাস করতে আসছে।—যেন সব কিছু হারিয়ে ফেলবে আজ মলিনা।

মলিনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ এক সময় সুধানাথের ঘরের দরজাটা খুলে যায়। মনে হয় চুলগুলো কে যেন ওর ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়েছে। চোখ দু'টো জবাফুলের মতো লাল। কাছে এসে মলিনার একটা হাত চেপে ধরে। অস্বাভাবিক গলায় বলে, 'চল আজ রাত্তিরে বাড়ি থেকে কোথাও বেরিয়ে যাই।'

'বেরিয়ে যাব!'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ। চল না রাস্তায়, গঙ্গার ধারে, কোনো ঠাকুরতলায়। হেঁটে হেঁটে কাহিল হয়ে ফিরে আসব।'

মলিনা উঠে দাঁড়ায়।

শান্তস্বরে বলে, 'না! এত কষ্ট তোমায় করতে দেব না। ভালো থাকার আমার দরকার নেই।'

চার বাড়ির কাজ করা একটা ঝি, সামান্য মাইনেয় বাসন মেজে দিয়ে যায়। ভোরের ঘুমটা ভাঙিয়ে দেয়, অধৈর্য কড়া নাড়ার শব্দে।

কিন্তু আজ যেন সে শব্দটা বুকের মধ্যে ঝনাৎ করে একটা লোহার ঘা মারল। যেন মলিনাকে ভয়ঙ্কর একটা শাস্তি দেবার গোঁ নিয়ে এই শব্দটা হানছে ও।

উঠি তো পড়ি করে ছুটে এসে দরাজাটা খুলে দিল মলিনা, আর সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল।

বসে পড়ল ধুলো কাদা আর জলে ভেজা গলিটায়।

যে এই শব্দের মুগুর হেনেছিল, সে কি মলিনার এই দুর্দশায় হেসে উঠল?

অস্ফুট চেতনায় ঘর থেকে মনে হল সুধানাথের একটা যেন হাসির শব্দ উঠল কোথায়।

যে হেসেছিল, সে কি ক্রূর একটা ব্যঙ্গের সুর নিয়ে কথাও বলেছিল কিছু?

মলিনারও মনে হল কী যেন বলল লোকটা। মলিনার মাথার মধ্যে শুধু শব্দটা ধাক্কা দিল। মলিনা কথাটা শুনতে পেল না।

তারপর মলিনা অস্ফুট চিৎকার করে উঠল, 'না, না, আমি মলিনা নই।'

সুধানাথ খুব জোরে একটা দরজা বন্ধ করার শব্দ পেল।

সুধানাথ ভাবল ঝিটা কি অসভ্য!

এই ভোরবেলা দুম দাম! তারপর ভাবল, কিন্তু মলিনা কেন ফিরে আসছে না। ওর সঙ্গে কী এত কথা কইছে! কিন্তু নিঃসাড়েই বা কেন?

অনেকক্ষণ পরে উঠে এসে বাইরে দাঁড়াল, বলল, 'তোমার ঝিয়ের সঙ্গে এত দেরী হচ্ছিল কিসের?'

মলিনা মাথা নেড়ে আস্তে বলল, 'কই আসেনি তো ঝি।'

'আরে! কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম, দরজা খোলার শব্দ পেলাম!'

'পাশের বাড়ি বোধহয়!'

'পাশের বাড়ি? কক্‌খনো না, কে এসেছিল বল?'

মলিনা বলল, 'অধিকার জন্মেছে বুঝি? তাই সন্দেহ করতে শুরু করছ।'

সুধানাথ একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মলিনার মুখের দিকে। আর সহজ সুরের সহজ কথা এগোল না। আস্তে সরে গেল।

একটু পরে মলিনা বলল, 'শরীরটা ভালো লাগছে না, বাইরে কোথাও খেয়ে নিতে পারবে?'

সুধানাথ অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'পারব না কেন? কিন্তু—তুমি?'

'আমি? খাবার মতো শরীর হয়, উঠব, রাঁধব, খাব।'

একটু পরে জামা জুতো পরে বেরিয়ে গেল সুধানাথ।

তখন ভর দুপুর।

মাধব ঘোষের বাসার জোয়ান পুরুষরা তখন সকলেই কাজের ধান্ধায় বাইরে। মেয়েরা কেউ কেউ সকালের রান্নার পাট সেরে রাতের রান্না সেরে রাখছে। কেউ বা স্কুল থেকে ফেরা ছেলেমেয়ের জন্যে রুটি গড়ে রাখছে। কেউ বা সব সেরে ভাতের কাঁসি নিয়েও বসেছে।

হঠাৎ চোখ পড়ল দাস গিন্নির।

চমকে উঠে বললেন, 'ওমা, তুমি আবার পোড়া মুখ পুড়িয়ে কোথা থেকে?'

মণ্ডল গিন্নি মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'কি গো দাস দিদি?'

নগেনবাবুর বউ বললেন, 'ওমা কী সর্বনাশ!'

সুখদা এল।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বলল, 'ওমা আমার কপাল! কাল মানুষটা সারাদিন এইখানে বসে, তখন তোমার টনক নড়ল না? বলি খবরটা দিল কে?'

মলিনা এত কথার উত্তর দিল না।

মলিনা শুধু উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলল, 'কোন্ ঘরে উঠেছে ও?'

'ঘরে আবার কি? এইখানেই। পাঁচ ঘরে। কত সাধলাম দু'টো খেতে। তা কী আর খায়! এত বড়ো ঘেন্না সয়ে যে হার্টফেল করেনি, খাড়া বসে ছিল, এই ঢের! তারপর কখন যেন উঠে গেল। তা তুমি আবার কী মনে করে?'

মলিনা আরও উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে, 'ও কি ওর জিনিসপত্তর রেখে গেছে?'

'শোনো কথা, জিনিসপত্তর আবার কোথা?'

'আজ আসেনি ও?'

'আজ আবার কই এল? আর আসে মানুষ? আর মুখ দেখায়? পরিবার যার পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, সে আর লোকালয়ে থাকে? মেয়ে জাতের মুখে তুমি কালি দিয়েছ মলিনা। তোমার কলঙ্কে আমাদের মাথা হেঁট!'

মলিনা উঠে দাঁড়ায়।

মলিনা রাস্তায় বেরিয়ে অনেকগুলো গলার হাসি শুনতে পায়।

লহরে লহরে হাসি।

তার সঙ্গে টুকরো টুকরো কথা।

'ঘরের খোঁজ! জিনিসপত্তরের খোঁজ! আবার সংসার করবার সাধ না কি লো? হতে পারে ছোঁড়া বোধহয় ভেগেছে। শুনল কোথায়? কে বলল?'

কানের পর্দাটা পুড়ে যাচ্ছে। এত রোদ কেন?

মলিনা ছুটতে শুরু করল।

মলিনা এই ভর দুপুরের চড়া রোদ থেকে পালাবে।

খবরটা আনল সেই হাবা, কালা মদনা।

বলল, 'ও বাবা গো, সে কী রক্ত! যেন এক কুড়ি পাঁঠা কেটেছে!'

তিন কুড়ি লোক ঠিকরে রাস্তায় বেরিয়ে এসে বলল, 'কোথায় কোথায়?'

'উই সেইখেনেই। সেই লেবেল ক্রসিংয়ের ওইখানে। মুখটা ছেঁচে যায়নি, তাই সদ্য চিনতে পারলাম বামুন কাকি। রক্তে আর কাপড়চোপড়ের কিছু পদাথ্যি নেই—'

ওরা শেষ অবধি শুনল না।

ছুটতে লাগল।

এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখবার সুযোগই বা ক'বার আসে জীবনে?

—ঃ ঃ—